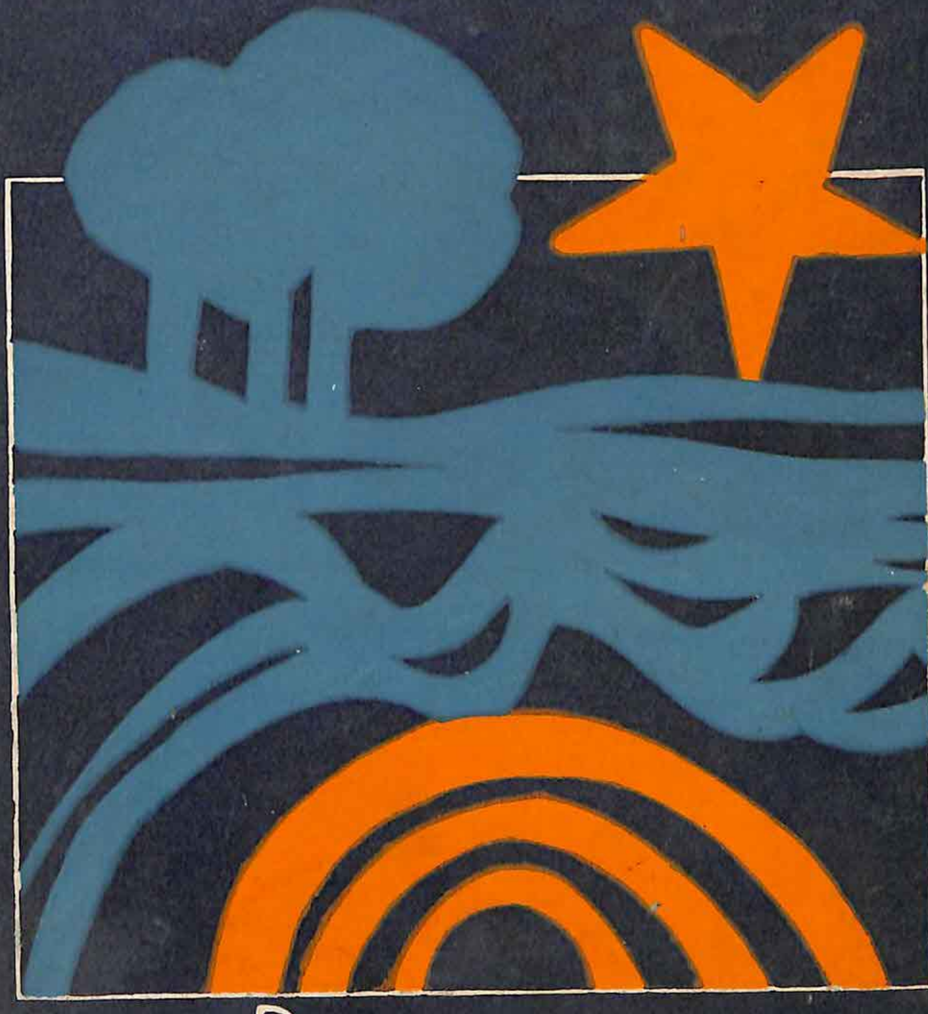


বিশ্ব-বিজ্ঞানের ইতিহাস



ধীমান দাশগুপ্ত

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাস

ধীমান দাশগুপ্ত

বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮১

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

পনেরো টাকা

সবকিছুরই ইতিহাস আছে, বিজ্ঞানেরও আছে। বিজ্ঞান যতটা না নির্মিত বস্তু তার চেয়েও বেশি নির্মিতি, ফলে এই নির্মাণ-পদ্ধতির ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকবে। যে ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানকে জানায় ও তার বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। গ্যয়টে, যিনি ছিলেন শৌখীন বিজ্ঞানীও, বলেছিলেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসই বিজ্ঞান। তবু ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই তফাত রয়েছে যে বিজ্ঞান ইতিহাসের মত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বাস্তবকে নিয়ে কাজ করে না, কাজ করে বাস্তবের একটি সরলীকৃত সংস্করণ নিয়ে। বিজ্ঞান বাস্তবকে ততটাই সরল ও বিমূর্ত করে নেয় যতটা না করলে বাস্তবকে কাজে লাগানো যাবে না। বিজ্ঞানের সেই ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে প্রাথমিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে দেশগত উল্লেখ যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে কেননা সভ্যতার উন্মেষ এক এক দেশে হয়েছিল এক এক সময়ে। পরবর্তী পর্যায়ে কালগত বিভাজন বাঞ্ছনীয় মনে করেছি যেহেতু সমৃদ্ধ বিজ্ঞানকে কোন ভৌগলিক সীমারেখায় বাঁধা যায় না। তুলনীয় চেখভের উক্তি—জাতীয় নামতা বলে যেমন কোন কিছু হয় না তেমনি জাতীয় বিজ্ঞান বলেও সীমাবদ্ধ কিছু নেই। গণিত বা মহাকাশবিজ্ঞানের বেলায় এটা যতটা সত্যি ভূগোল বা উদ্ভিদবিদ্যার বেলায় ততটা নয়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা দেশের বিজ্ঞানচর্চাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করে ও বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় তার প্রতিফলনও দেখা যায়। এই কারণে ও এ ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি এত দ্রুত হচ্ছে ও এত বিশেষজ্ঞ-বিষয় ভিত্তিক হয়ে উঠেছে যে সাম্প্রতিকতম কালের জন্য বিজ্ঞানের বিষয়গত বর্ণনা ছাড়া উপায় নেই।

বইয়ের উদ্দেশ্যকে একটা ছোট কবিতায় বোঝানো যায়—চোখ রাঙালে না হয়, গ্যালিলিও / লিখে দিলেন, পৃথিবী ঘুরছে না / পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও / যতই তাকে চোখ রাঙাও না।[১]

বিজ্ঞানের প্রতি যুগ যুগ ধরে এই চোখ রাঙানি ধর্মের, সমাজের, রাজনীতির। কখনো বিজ্ঞান নিজেও অবিচার করেছে বিজ্ঞানের প্রতি। বিজ্ঞানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এই যে নানান্ প্রসঙ্গ ও বিষয়ের সঙ্গে তার সংযোগ ও বিনিময় ছিল ও আছে অবিরল। রচনার ফাঁকে ফাঁকে তারই বর্ণনা ও বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছি। সংস্কৃতিসহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিহীন বিজ্ঞানের মধ্যে ততটাই পার্থক্য মানুষ ও রোবটের মধ্যে যতটা। অন্ধকারযুগ পেছনে ফেলে রেখে এসে অন্ধ যন্ত্রযুগে গিয়ে যাতে যাত্রা শেষ না হয় তা দেখার ভার মানুষেরই। আমার আলোচনা অ্যাকাডেমিকভাবে নয়, করতে চেয়েছি ক্যানডিড ভংগিতে যাতে প্রথম থেকেই পাঠক এই আলোচনার অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। খুলে মেলে, এগিয়ে পেছিয়ে, উঠে নেমে আলোচনা করেছি ঠিক যেন বিজ্ঞানের বিকাশ ও পর্যালোচনা নিয়ে একটি চিত্রনাট্য। আজ থেকে চার বছর আগে মারগারেট ম্যালেটের উৎসাহে যে বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলাম এতদিনে তার প্রথম পর্ব লেখা শেষ হল, তাকে ধন্যবাদ দেওয়া বাহুল্য, তার কল্যাণ হোক। লেখার কাজে নানান্ সাহায্যের জন্য বীতশোক ভট্টাচার্য ও ড. টি ল্যালি, নিরলস সহযোগিতার দরুণ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা সেনগুপ্ত ও স্মিতা ভট্টাচার্য ধন্যবাদার্হ। যে সব নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ থাকবেই। যেখানে অতিরিক্ত মতভেদ আছে সেখানে ইংরেজি বানান ব্যবহার করেছি। প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির এই আলোচনায় কোথাও কোথাও কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করতেই হয়েছে। পাঠক দেখবেন আমার আলোচনা সেইসব মন্তব্য-নির্ভর না মন্তব্যগুলিই আলোচনা-প্রসূত।

লেখক

বিজ্ঞানের বিষয়গত অগ্রগতি ও ইতিহাস /

আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা /

শ্রদ্ধেয়া সুব্রতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে

ভূমিকা

পুরাণ

পুরাণ বা মীথ হল প্রাচীন উপাখ্যান, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন বিষয়ে জাতীয় বা উপজাতীয় উপাখ্যান। পৌরাণিক বিশ্বাস হল মানুষের এই বিশ্বাস যে, প্রকৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং পৃথিবী তাদের লীলাভূমি। অর্থাৎ মীথ বা অতিকথায় মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা রয়েছে, যে সম্পর্ক মূলত ধর্মগত ও অতিপ্রাকৃতিক হলেও কখনো কখনো পরিবেশগত ও সমাজগতও বটে। প্রথম সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মীথ অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্ব সমূহের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে আদিম চিন্তাধারার অবাস্তব প্রকাশ। দ্বিতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অতিকথা কথিত কাহিনীর চেয়ে বেশি কিছু, তখন তা দূর অতীতে ঘটে থাকা কিছু ঘটনার বিবরণ যা পৃথিবী ও মানুষের ভাগ্যকে তখনও নিয়ন্ত্রিত করছে বলে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ পুরাণ এখানে এক ধরনের সচল বাস্তবতা। বাস্তব-ও ক্রম-পরিবর্তনের ব্যাপারটি থাকে বলে পুরাণ তখন অভিজ্ঞতা এবং পৌরাণিক কল্পনার পরিপূরকতা ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি। সব অতিকথাতেই তৎকালীন প্রয়োগকৌশলের যে মান ও সামাজিক সংগঠনের যে চরিত্র তার প্রতিফলন থাকবে, যদিও নানান্ ধার্মিক ও শাস্ত্রীয় প্রক্ষেপে সেই প্রতিফলন প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন স্বর্গোদ্যানে আদম ও ইভ-এর মীথটি আসলে মানুষের পশু শিকার থেকে কৃষিতে উত্তরণের কাহিনী, কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশের ফলে তা মানুষের আদি পাপ ও নারীর প্রলোভনজনিত অতিকথায় রূপান্তর পেয়েছে। তবু পুরাণ কোন প্রতীকী দর্শন নয়, বরং বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ বর্ণনায় তা প্রাচীন মানুষের আদিম বিশ্বাস ও নৈতিক ধারণার

বাস্তবধর্মী উল্লেখ। বাস্তবধর্মী এই কারণে যে কার্যকারণ সম্বন্ধের ওপর নজর পড়ছে।[২] আবার বিশ্বাস ও নৈতিক ধারণার মুখপত্র হিশেবে তা জীবনযাত্রার অঙ্গও। অর্থাৎ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যপরায়ণ পুরাণ ততটা জড় কাহিনী নয়, বরং এক সক্রিয় শক্তি, সাংস্কৃতিক শক্তিই যেন। বর্ণনামূলক বলে এর সাহিত্যিক দিকটিও উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী কালের মহাকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্য রচনায় প্রেরণাস্বরূপ। নানা জাতির পুরাণ এক সাথে মিলিত হয়ে ও পরস্পর ভাববিনিময় করে গড়ে তোলে এক সর্বজনীন পুরাণশাস্ত্র।

পৌরাণিক যুগের প্রথম পর্বে পৌরাণিক দেবতাদের প্রাধান্য, দ্বিতীয় পর্বে প্রাধান্য যাগযজ্ঞ ও তন্ত্রমন্ত্রের, পরিভাষায় যাকে বলে ম্যাজিক। মীথের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে ম্যাজিক পৌরাণিক দেবতাদের বদলে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক রূপে কল্পনা করেছিল। কল্পনা করেছিল যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দু প্রকার শক্তিতে গঠিত—প্রথম শক্তি স্বর্গীয় সুষমার উদ্দেশে ধাবিত, দ্বিতীয় শক্তি বিশৃঙ্খলার দিকে চালিত, দ্বিতীয় শক্তির তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী সাফল্যই সমস্ত দুর্ভাগ্য ও অন্যায়ের কারণ যা এমনকি দেবতাদেরও বিভ্রান্ত করে। ম্যাজিকের মূল লক্ষ্য এই শক্তির উপস্থিতি আগে থেকেই অনুমান করা, তাকে দাবিয়ে রাখা, ও তাকে নিজেদের কাজে লাগানোও। ফলে বিজ্ঞানের খেত তৈরিতে ম্যাজিক জলসেচের কাজ করেছিল বলা যায়। এই সময়ে এসে মীথ ম্যাজিকের জন্য নবতর প্রতীতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য যোগাতে শুরু করে। জীবন ধারণের বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের বিমূর্ততার মাঝামাঝি তখন ম্যাজিকের অবস্থান। যে সমস্ত নিয়ম প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলি জানা ও বোঝা গেলে মানুষ নিজেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এই আত্মবিশ্বাসের উপর ম্যাজিক দাঁড়িয়ে। তাই ম্যাজিক বস্তুগুণ ও বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে প্রয়াসী যা বিজ্ঞানেরও লক্ষণ। অবশ্য ম্যাজিক ঐতিহ্যলালিত, বিজ্ঞান অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বিজ্ঞান যুক্তি ও বিচারগ্রাহ্য, পর্যবেক্ষণের দ্বারা ক্রমাগত সংশোধিত, আর

ম্যাজিকের মুখ রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় মুখোশে ঢাকা। যুক্তি নয়, ভাবাবেগই তার চালক। কালক্রমে ধর্ম—যা কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের অক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে দেয়—ম্যাজিককে গ্রাস করে নেবে ও বিশিষ্ট স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা হিশেবে বিজ্ঞান তার প্রতিরোধী হয়ে উঠবে। যাদুক্রিয়া এই পর্যায়ে ভীষণভাবে আনুষ্ঠানিক : রঙের ঔজ্জ্বল্য, গ্রন্থিতে শক্তিবন্ধন, বৃত্তের গুণাগুণ, জলের স্খালন ক্ষমতা, আগুনের গ্রহণ শক্তি, অজস্র উপাদান ঘিরে তার কর্মকাণ্ড। এখানে প্রশ্ন—বিজ্ঞানের উদ্ভবের পরও ম্যাজিক তার বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও কীভাবে টিঁকে ছিল। প্রথমত যাদুকররা যাদুক্রিয়া সফল না হলে বলত, ঠিকভাবে ক্রিয়াকর্ম করা হয় নি বলে ব্যর্থতা এসেছে, আবার করা যাক। ফলে সাফল্য না আসা অবধি যাদুক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হত। দ্বিতীয়ত, ব্যর্থতার কারণ হিশেবে অন্য কোন যাদুকরের পালটা যাদুক্রিয়ার কথা বলা হত। আর সবশেষে মানুষের স্মৃতির এই অভ্যাস তো আছেই যে সাফল্য ও তৎজনিত আনন্দের ঘটনা যত মনে থাকত, ব্যর্থতা ও তৎজনিত তিক্ততার স্মৃতি ততটা থাকত না।

সমাপ্তিতে বলা যাক, সময়ের অগ্রগতি সত্ত্বেও পুরাণ কখনোই অতীতকালের মৃতপ্রায় প্রস্তাবনামাত্র হয়ে ওঠে নি, জীবন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরবর্তীকালেও ছিল সব সময়ে সৃষ্টিশীল না হলেও কখনোই বন্ধ্যা নয়।

মানব

জীবনের উৎস ও তার ক্রমবিকাশের অধ্যয়নে দেখি মানবাকৃতি জীব থেকে বনমানুষ পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনে প্রায় দশ লক্ষ বছর লেগেছে। মানবাকৃতি জীবদের প্রথম বসতির ও মানুষের প্রথম প্রযুক্তিকৌশল (মৃৎশিল্প) আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে পাঁচ লক্ষ বছরের ব্যবধান। কিন্তু বনমানুষের এই স্তর থেকে পরবর্তী বিকাশ ঘটেছে অতি দ্রুত। আদি-

মানুষেরা বনমানুষ থাকা অবস্থাতেই মানব সংস্কৃতির উদয় ঘটেছিল যার জন্য বুদ্ধির উদ্ভবের অবশ্যই দরকার হয়েছে। ৪০,০০০ বছর আগে থেকে এই অতি দ্রুত বিকাশের সূচনা। আগুন জ্বালানো হয়েছে, পোশাকের প্রচলন; অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, অলংকারের চল; তৈরি হয়েছে পাথরের যন্ত্রপাতি, আঁকা হয়েছে গুহাচিত্র। নিরামিষাশী থেকে মানুষ আমিষাশী হয়েছে অর্থাৎ উত্তম পুষ্টির ব্যবস্থাও করেছে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো পশু-জীবন ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আদি-মানুষ তুলনামূলক ভাবে অল্প দিনেই মস্তিষ্কের একটা খুব দ্রুত উন্নতি সাধন করেছে মনে হয়। ভাবতে শিখেছে, হৃদয়বৃত্তি অনুভব করেছে, নৈতিক মান চালু করেছে, শিখেছে মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে। একটু কি আকস্মিক, এই সূচনা? অনেকের মতে[৩] বিভিন্ন সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠী এক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য বাঁচার লড়াই লড়তে লড়তে এই মানের মননশক্তি কখনোই আহরণ করতে পারত না যদি না প্রচলিত উপাদানগুলি ছাড়াও আরও একটা শক্তি তাকে শিক্ষিত করে তুলতে অংশ না নিত যা বিবর্তনবাদীদের দৃষ্টি হয়ত এড়িয়ে গেছে। কী ভাবে মানুষ আগুন জ্বালাতে বা গুনতে শিখল? পুরাণে তো ভবিষ্যদ্বক্তা বা বীরপুরুষদের কথা আছে যারা দেবতাদের কাছ থেকে এই সব তত্ত্ব জেনে নিয়ে সাধারণ মানুষকে জানাত। সে তো গল্পকথা। আসলে?

আদি-মানুষের মূক ভংগি, কাটা কাটা শব্দ ও শাব্দিক প্রতীক থেকেই ক্রমে জন্ম নিয়েছে মানুষের ভাষা। একদিক দিয়ে দেখলে পুরাণেই রয়েছে আদি-মানুষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম উদাহরণ। নামকরণ ও নাম করলে বস্তুকে চিনতে পারা—এই হল জ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। লিপি আবিষ্কার করার আগে মানুষ চিন্তাকে আকাঙ্ক্ষাকে প্রার্থনাকে রূপ দিয়েছে ছবি এঁকে। ভাষা তৈরির পর যেমন জন্ম নিয়েছে লোককথা, ধাঁধা। পৃথিবী জুড়ে এই সব গুহাচিত্র, ধাঁধা, লোককথায় কিন্তু অনেকটা একই ছাঁদ, অনেকটা একই ধারণা ও সম্পর্কের প্রকাশ। আজও এগুলির ভাষা অনুশীলন করে, শিশুদের আঁকা ছবি বিশ্লেষণ করে, কেননা শিশুরা যেন মানুষের ক্রমবিকাশের

কয়েকটি পদক্ষেপেরই পুনরাবৃত্তি করে ও এখনও আদিম জাতিগুলির, যারা ক্রমবিকাশের অত্যন্ত প্রাচীন স্তরে রয়ে গেছে, জীবনধারা সমাজবিন্যাস চারুকলা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বহু অন্ধকার অধ্যায় আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আগুন ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখা আদি-মানুষ তার বিজ্ঞান চেতনার পাশাপাশি ভাষা লিপি ও সংস্কৃতি-র শিল্পচেতনাকেও সমৃদ্ধ করে তুলছে। বিজ্ঞানচেতনা—কেননা হাতিয়ারই হল পদার্থ ও যন্ত্র বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক সূচনা, আগুনে যেমন রসায়ন বিজ্ঞানের আরম্ভ। রান্নাই তো সবচেয়ে প্রাচীন রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আবার ফলমূল আহরণ করতে গিয়ে গাছপালা, আর শিকার করতে গিয়ে জীবজন্তু পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই ক্রমে জীববিদ্যার উৎপত্তি। গুহাচিত্রে জীবজন্তুর নানান্ ছবি তো শুধু আদিম চিত্রকলাই নয়, শারীরস্থানের সূচনাও। এইভাবেই শিল্পচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনা পরস্পরের বিনিময়যোগ্য হয়ে উঠছে।

সে ছিল মানুষের অতীত। মানবের ক্রমবিকাশকে আমরা এর পর মানুষের সভ্যতা-য় নিয়ে আসব। তবে ঐতিহাসিক মূল্যায়নে মানুষ কিনা অতীত আর বর্তমানের যোগফল তাই আবার আমাদের ফিরতে হবে মানববিদ্যায়—মানুষের সমস্ত আচার আচরণ ও কার্যকলাপকে যখন দশটি প্রাথমিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যাকে নৃতাত্ত্বিক মুদ্রা পদ্ধতি বলা যেতে পারে—১. মিথস্ক্রিয়া ২. সম্বন্ধ ৩. জীবন ধারণ ৪. যৌনচেতনা ৫. স্থানচেতনা ৬. কালচেতনা ৭. জ্ঞানার্জন ৮. বিনোদন ৯. আত্মরক্ষা ১০. প্রযুক্তি। খুব সংক্ষিপ্ত উদাহরণে বলা যাবে, ভাষা যোগাযোগ ইত্যাদি মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে, সমাজ শ্রেণী সরকার ইত্যাদি সম্বন্ধের মধ্যে, জীবিকা প্রতিপালন প্রমুখ জীবন ধারণে, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রমুখ জ্ঞানার্জনে, খেলাধুলো আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি বিনোদনের মধ্যে, সংরক্ষণ প্রতিরক্ষা প্রভৃতি আত্মরক্ষার ভিতর পড়বে।[৪] এই বিস্তৃত প্রসঙ্গ আসবে আমাদের সর্বশেষ আলোচনায়।

মানুষের সভ্যতা

প্রথমেই বলেছিলাম, পুরাণ হচ্ছে প্রাচীন মানুষের আদিরূপ-সংক্রান্ত চেতনার ও অবাস্তব দর্শনের প্রকাশ। আমাদের আদিম পূর্ব-পুরুষেরা দেবতাকে সৃষ্টি করেছিল দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক ঘটনার—যা তাদের আয়ত্তাধীন নয়—প্রতীক হিশেবে, যে প্রতীক মেঘ বিদ্যুৎ বজ্র সূর্য তারা অগ্নি। যে দৈবনির্ভরতা খাপছাড়া আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার বাইরে তখনও অন্য কোন ধর্মীয় চিন্তার রূপ পায় নি। মানুষের বিবর্তনের মোটামুটি নিয়মিত যে ইতিহাস আমরা পাই তা খৃষ্টপূর্ব (খৃ. পূ.) ২০,০০০ বছর থেকে, যে সময়টা প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির যথেষ্ট ব্যাখ্যা না পেয়ে ও তার থেকে আত্মরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে না পেরে যদিও মানুষ দৈব-নির্ভরই রয়ে গেল তবু শুধু প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য ও কারণের উপর নির্ভর না করে পার্থিব প্রয়োজনকে মেটাতে ও পার্থিব বিপদকে প্রতিহত করতে সে নিজেই সচেতনভাবে উদ্যোগী হতেও লাগল। এর ফলে মানুষকে কর্মঠ হতে হল, যে শ্রম জীবজগতে তাকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এনে দিল। আহার্য—ফলমূল বা প্রাণীর মাংস-আহরণে প্রয়োজনের দাবী তাকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে বাধ্য করল। অর্থাৎ ধর্মবোধ জন্মাবার পূর্ব হতেই মানুষ মনন ও কল্পনার অধিকারী হচ্ছিল। এরপর এল আনুমানিক খৃ. পূ. ১০,০০০ বছর থেকে শুরু হওয়া নতুন প্রস্তর যুগ। এই সময় মানুষ কিছু কিছু পশুকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাল। হিংস্র প্রাণীদের বধ করতে বা বশ্যতায় আনতে আরও গোষ্ঠীবদ্ধ ও উন্নত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাল। পশুশিকার ও পশুপালনে রীতিমত সমৃদ্ধি এল। যাদুবিদ্যার সূচনা ও প্রভাব ঘটল এই সময়েই। প্রযুক্তি কৌশলের খামতি আধা দৈবিক উপায়ে মেটাবার বাসনা থেকেই যাদুর আবির্ভাব। এরপর খৃ. পূ. ৬০০০

বছর থেকে মানুষ নিজের জমিতে ফসল উৎপন্ন করতে শিখল। আর মোটামুটি সে সময়েই চতুর বুদ্ধিবৃত্তির কিছু লোক কমবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে পুরোহিত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু অধিক শারীরিক ক্ষমতার লোকরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে না চাওয়ায় আরও একটি আলাদা শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের জন্ম হল। তখন পুরোহিতশ্রেণী সামন্তগোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ কিছু চুক্তি ও নিয়মবদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করল। রাজা হচ্ছেন দেবতার প্রতিনিধি আর পুরোহিত হচ্ছেন দেবতার অবতার, এই কথা প্রচলন ও স্বীকৃতি পেল। এদেরই পাশাপাশি রইল সর্বাধিক জনসংখ্যার সাধারণ শ্রেণী—কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকরা—জমি চাষ, ফসল বোনা, ফসল কাটা, ফসল তোলা যাদের কাজ আর বৃত্তি। দেখা দিল সবচেয়ে সহজ সব কুটিরশিল্পও। পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্র এক সাথে এই খেটে খাওয়া মানুষদের ওপর প্রভুত্ব করা শুরু করল। কৃষি সভ্যতায় যাদুক্রিয়ার রূপ ও রীতিও পরিবর্তিত হল। পুরোহিত শ্রেণী সাধারণ মানুষকে দিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পর্যায়ে ও কৃষিকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করাত যার থেকে বিভিন্ন ব্রতের জন্ম। এই ব্রত ছিল মূলত লোকজীবনের অঙ্গ, আদিম সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ছিল লোকবৃত্তের অনুকরণ, কেননা সংস্কৃতি শ্রেণীচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু যাদুবিদ্যা সব সময়েই ছিল ক্রিয়াভিত্তিক—কোন বিশেষ ক্রিয়া-বা বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়া-য় অপরের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা—পুরোহিততন্ত্র প্রভাব বিস্তারের জন্য নীতিবাদের জন্ম দিল, জীবনযাপনে বহু বাধা নিষেধ আরোপ করল। বাগভাষা আয়ত্ত করার সাথে সাথে এগুলি আরও বিস্তৃত ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠল। মানুষের জন্য তৈরি করা ধর্মবোধ এইভাবে কৃষি সভ্যতার উন্মেষের মধ্য দিয়ে আরও দৃঢ়ভিত্তিক হল। মাটি, নদী আর সূর্য—মানুষের তিন চিরন্তন আশ্রয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তখন উপলব্ধির এই ঐক্য প্রতীয়মান ছিল। বলা দরকার, সভ্যতার প্রাথমিক উন্মেষ ও বিস্তার

ঘটেছিল নদীমাতৃক এলাকাগুলিতেই সভ্যতার পক্ষে যারা ছিল অনুকূল পরিবেশ।[৫]

কৃষি যুগের সময় থেকেই চিহ্নিত লিখিত চিত্রিত দলিলপত্র, চুক্তিপত্র, পাঁজির হিশাব, শিলালিপি এসবও মোটামুটি নিয়মিত ভাবে রয়ে গেছে। সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে সংখ্যা ও অক্ষর আবিষ্কারের অবদান ছিল প্রচুর। অক্ষরের উন্নতি শুধু ভাষা নয় গণনাবিদ্যাকেও এগিয়ে দিয়েছিল। ব্যবসা এবং অর্থনীতিরও উন্নতি হতে লাগল। ওজন ও মুদ্রার নির্দিষ্ট একক দেখা দিল। অর্থবিনিময়, বস্তুবিনিময়ের চলন হল। ধাতু—তামা ও ব্রোঞ্জ—আবিষ্কৃত ও তার ব্যবহার হতে লাগল। পশুশক্তির এবং চাকা লাঙল ও কাস্তের ব্যবহার শুরু হল। চাকার আবিষ্কার প্রযুক্তিকৌশলে, বলা যায়, বিপ্লব এনেছিল। ক্রমে চাষীদের পঞ্জিকার দরকার হয়ে পড়ল, ব্যবসায়ীরা শিখল সমুদ্রযাত্রা করতে। উভয়ের জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন বাড়ল। এই সময় থেকেই সংখ্যার দিকে বিশুদ্ধ আকর্ষণ দেখা দিল। জন্ম হল বিমূর্ত সংখ্যার : ভগ্নাংশ এল। সূচক। সভ্যতায় সভ্যতায় সংযোগে ও বিনিময়ে ভাবনা ও জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটল। বসতির স্থানান্তর ও ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ, সংযোগের এই দুই ছিল মূলধারা।

খৃ. পূ. ৩০০০-য়ে পৃথিবীতে যখন বড় কয়েকটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যেমন মিশরের সভ্যতা, ৪০০০ খৃ. পূ. থেকে যার সমৃদ্ধি, প্রায় সমসাময়িক বাবিলোন আসিরিয় সভ্যতা, এবং এশিয়া-মাইনর ও গ্রীসের সভ্যতাও, নানান জ্ঞান, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, মৃন্ময়লিপি-শিলালেখ, যুদ্ধবিগ্রহ-বিজয়কৃতিত্ব অবলম্বন করে যে সব সভ্যতা, রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে তখন আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য-জাতির বাস। বাস্তব সভ্যতায় এরা অনেক পেছিয়ে থাকলেও এদের মধ্যে কিছু মানসিক ও নৈতিক গুণের সূচনা হয়েছিল। এরা একই সঙ্গে ছিল কর্মী ও চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং যথেষ্ট সংঘবদ্ধও। এদের মধ্যে স্ত্রীজাতির বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। রুশদেশের বন্য ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে এরা ঘোড়ার পিঠে চেপে

দূরপথ অল্পসময়ে অতিক্রম করার এক অনবদ্য উপায় আবিষ্কার করে। ঘোড়ার ব্যবহার অন্যত্র তখন জানা ছিল না। ফলে খৃ. পূ. ২০০০-য়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে আর্যরা যখন পিতৃভূমি ছেড়ে পুবে দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল তখন বাস্তব সভ্যতায় পেছিয়ে থাকা কিন্তু সংঘবদ্ধ এদের প্রতিহত করা সুসভ্য মিশর, আসিরীয়-বাবিলোন, এশিয়া-মাইনর ও গ্রীসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। শুরু হল আর্য প্রাধান্যের যুগ। তারা ভারতে যখন এল মোটামুটি সভ্য দুটি বড় অনার্য জাতি তখন এখানে বাস করছে। সেই দ্রাবিড় ও কোলদের নিজস্ব ইতিহাস ছিল। আর্যদের সঙ্গে তাদের সংঘাত ও মিশ্রণে হিন্দুজাতির পূর্ণ রূপ গ্রহণে সাহায্য হল। ১৩০০/১৪০০ খৃ. পূ. থেকে এই হিন্দুসভ্যতার আরম্ভ। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় হিন্দুসভ্যতা বয়সে অনেক আধুনিক, বড় জোর প্রাচীন চীনা সভ্যতার ও গ্রীকো-রোমান সভ্যতার সমকালীন ও সম সময়শীর্ষক।

মোটামুটি এই সময় থেকেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি, চীনা সভ্যতা ছাড়া, অবক্ষয়ে আক্রান্ত হতে শুরু করে, সভ্য জীবনযাত্রার প্রণালী ঠিকই অনুসৃত হত, কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যে নতুন কিছু করার প্রবণতা কমে গেল, কুসংস্কারের নিচে পড়ে ধর্ম আহত হল, জ্যোতিষ ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রগতি ব্যাহত হল, এমনকি পুরনো জ্ঞানের অনেকটাও গেল হারিয়ে। লৌহযুগে এসে, অর্থ নৈতিক ও প্রাযুক্তিক বিচারে খৃ. পূ. ১২০০ থেকে যে যুগের জের টানতে হয়, আর্য প্রভাবিত পৃথিবী এই সমস্ত বিস্মৃত জ্ঞান ও কলাকৌশলের পুনরুদ্ধার করবে, ঋণস্বীকার ছাড়াই করবে। লৌহযুগের বিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে এইভাবেই নিয়েছে। বস্তুত লৌহযুগের মানুষরা ও তাদের পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত সভ্যতার ধ্বংসে অংশ নিয়েছে সেই সভ্যতাগুলির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিষয়ে তাদের নিজেদেরও এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবু অনুসন্ধিৎসা, সংঘাত, সমন্বয়—এই যখন সভ্যতার চারিত্রিক ধারা তখন সৃষ্টির কারণে ধ্বংস স্বাভাবিক, ঐতিহাসিকও। যে সৃষ্টির কাজে

যুগে যুগে, শতকে শতকে বিজ্ঞানের ভূমিকা এইবার আমাদের বিবেচ্য, বিচার্য। মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নিয়ে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতি ও তার নিয়মগুলিকে অধ্যয়ন করা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে লাগাবার ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকেই যে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। গণিত সম্পর্কে এঙ্গেল্‌সের উক্তিটি সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, বিজ্ঞান হচ্ছে বস্তুপুঞ্জে বাস্তব জগতের দেশগত ও পরিমাণগত সম্বন্ধ, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সারবস্তু।

বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঃ প্রাগৈতিহাসিক সূচনা

বিজ্ঞান চেতনা কীভাবে মানুষের ভেতর কাজ করছিল ও দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো কাজের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক উপাদান থেকে যাচ্ছিল তার সামান্য উদাহরণ আগে দিয়েছি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জিতে যাবার মত কিছুই মানুষের ছিল না, না ছিল বাঁদরদের মত শারীরিক ক্ষিপ্রতা, না ছিল দুরন্ত শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জন্তুদের মত লোমশ শরীর, তাছাড়া, শৈশব অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে জীবজগতে মানুষেরই সময় লাগে সবচেয়ে বেশি। বারট্রাণ্ড রাসেল বলছেন মানুষের যা ছিল তা হল, এক ঃ মস্তিষ্ক, যা তাকে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে, দুই ঃ বাগভাষা ও লিখন প্রণালী, যা তার অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানকে বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। ফলে অর্জন, সংরক্ষণ, নতুনতর অর্জন—এক সংযোজক পদ্ধতিতে মানুষের মানসিক ও পার্থিব সমৃদ্ধি শুরু হয়। বিবর্তনের ইতিহাস কালক্রমে বুদ্ধি-কেই জীবজগতে প্রাধান্যের প্রধান হাতিয়ার হিশেবে রায় দেয়। শুরুতে খুব সচেতন-ভাবে যে মানুষ দক্ষ হয়ে উঠেছিল তা নয় কিন্তু খুব সচেতন ভাবে সে দক্ষ থেকে গেল[৬]।

চল্লিশ হাজার বছর আগের মানুষ ছিল পশুশিকারী, শিকার করত বুনো ঘোড়া, বুনো মোষ, বুনো হাতি, শিকার করত পাথর ছুঁড়ে, ছুঁচলো পাথর দিয়ে, ফাঁদ পেতে। তারা গৃহ নির্মাণ করত ক্বচিৎ কখনো। না, কুকুর তাদের ছিল না। ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তিত হল, মানুষ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল, যদিও নিজের পরিবারের চেয়ে বড় কোন গোষ্ঠীর চিন্তা তখনও আসেনি। পরিবারের প্রচলনে

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সূচনা ঘটল—পিতার কর্তৃত্ব, মাতার উপর নির্ভরতা শিশুদের প্রতিপালন, তরুণদের সামর্থ্যের প্রতি বৃদ্ধদের স্বাভাবিক ঈর্ষা। এই সময় থেকে পাথর ছাড়াও হাড়ের হাতিয়ার এল, খাল ও নদী থেকে মাছ ধরা শুরু হল, পশু শিকারের চেয়েও জোর পড়ল পশুপালনে। অবশ্য খাবার হিশেবে পশুর দুধ ব্যবহার তারা তখনও শেখেনি। পশুশিকারে জোর কমায় মানুষের সহজাত হিংস্রতা কোন কোন মনস্তাত্ত্বিকের মতে তখন নিজের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষের দিকে চালিত হল। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য মানুষ আরও সংঘবদ্ধ হল, বিভিন্ন পরিবার একত্র হয়ে সমাজ গঠন করল। নানান বিষয়ে দক্ষতা বিশিষ্ট কয়েকটি পরিবার মিলে এই সমাজ গড়ত। পরে কয়েকটি সামাজিক বসতি নিয়ে উপজাতি, ও আরও পরে কয়েকটি উপজাতির সংঘাত ও সমন্বয়ে জাতি গঠনের ভিত্তিভূমি তৈরি হল।

সুনির্দিষ্ট সামাজিক গঠন ও সমাজ বিন্যাসের জন্য অবশ্য কৃষির আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে হয়েছে। নিজে ফসল বোনার আগে মানুষ মাটিতে আপনা থেকে বেড়ে ওঠা ফসল তুলে ব্যবহার করেছে। এইভাবেই ফসলের খাদ্য হিশেবে ব্যবহার ছাড়াও বেত দিয়ে ঝুড়ি তৈরি, গাছের ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি, এসব হয়েছে। বিষাক্ত গাছগাছড়া থেকে উপকারী গাছপালাকে সে আলাদা করে নিয়েছে। উদ্ভিদাশ্ম থেকে জানা গেছে মানুষ খাদ্য হিশেবে ব্যবহার করেছিল বাদাম, আপেল, নাশপাতি, শাক, গম, সর্ষে, জলজ লিলি ফুল, ওক ফল, আঙুর আর চাষ করেছিল লাল ও সাদা গম, বার্লি, তিসি এবং প্রায় দুশো পঞ্চাশ রকমের গাছগাছড়া। ধান চাষ হয়েছে পরে, খৃ. পূ. ৫০০০-এ চীনদেশে। পশুপালন? ৭০০০ খৃ. পূ.-র মধ্যে গাধা, গরু, মেষ, ছাগল, শূয়োর পোষ মেনেছে। এর চার হাজার বছর বাদে আর্যজাতির হাতে ঘোড়া, মধ্য এশিয়ায় উট পোষ মেনেছে। আরও দু হাজার বছর পরে পোষ মানিয়েছে মুরগিকে। শুধু পশু বা পাখি নয়, গুগলি শামুক কাঁকড়া কচ্ছপ শাঁখের ব্যবহারও সে জানত—খাদ্য হিশেবে, গয়না হিশেবে, বাসনপত্র হিশেবে।

আগে প্রয়োজন, তারপরে উদ্ভাবন। বসতির কাছাকাছি ভূপৃষ্ঠের উপরকার পাথর ফুরিয়ে যেতে সে মাটি খুঁড়ে পাথর যোগাড় করতে শুরু করল, একে বলব খনন বিজ্ঞানের আদিতম উদাহরণ। সে ছিল আগ্রহী পর্যবেক্ষক, রাতে তাকিয়ে থাকত আকাশের তারার দিকে, লক্ষ করত তাদের গতিপথ, যাযাবর মেষ পালকেরা ছিল এ কাজে আরও পটু কেননা তা তাদের যাত্রাপথে নিশানা যোগাত। জ্যোতিষে মূল আগ্রহ ছিল চাঁদ, সূর্য ও তারার উদয়, অস্ত ও গতিপথের পর্যবেক্ষণে। তারা মনে করেছিল ধ্রুব তারা নড়ে না, স্থির। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্ম হয়েছে একই সঙ্গে। সে প্রথম তামা গলিয়েছিল ৬০০০ খৃ. পূ.-এই, এর নিয়মিত ব্যবহার কিছু পরে। তার জ্যামিতিক মূর্তি অঙ্কন—বিন্দু রেখা বৃত্ত চক্র বর্গক্ষেত্র উপবৃত্ত ত্রিভুজ—এর দু হাজার বছর আগে থেকে অলংকরণের গণ্ডী ছাড়িয়ে গাণিতিক মর্যাদা পেতে আরম্ভ করে। এই সব সাফল্যের পাশাপাশি ছিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত। ফলে খাদ্য সঞ্চিত রাখতে হল, পরিবেশ পরিষ্কার রাখার—দূষিত না করা ও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার (প্রথম স্বাস্থ্যবিধি এই) দরকার পড়ল, পাথর দিয়ে নদীতে বাঁধ দিতে শিখল আরও পরে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বরফ জমল ও উষ্ণ অঞ্চলের প্রাণীরা আরও দক্ষিণে সরে গেল গুহাচিত্র থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সব ছবি সেই সময়ে পৃথিবীর অবস্থা ও মানুষের জ্ঞান কেমন ছিল জানতে অনেকটা সাহায্য করে। এ রকম গুহাচিত্রে মাছের কানকো মুখ চোখ কাঁটা অস্থিসন্ধি ও পরিপাক যন্ত্র পর্যন্ত আঁকা আছে।

প্রাগৈতিহাসিক সময়ে অগ্রগতির মান সর্বত্র সমান ছিল না, স্থান থেকে স্থানে তার অদল বদল ঘটত। গৃহনির্মাণ, অলংকরণ ও হাতিয়ারের ব্যবহারে পার্থক্য দেখা দিত, কৃষি পদ্ধতি, কী কী ফসলের চাষ হচ্ছে ও কোন্ কোন্ পশুর পালন—সব মিলিয়ে একটা সমাজের সামাজিক অবস্থাটি গড়ে উঠত। ও তার মান। আজ থেকে হাজার পাঁচেক বছর আগের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে পশ্চিম এশিয়া,

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ ও নীল নদীর অববাহিত এলাকায় বড় শহর ও সুন্দর ইমারতে সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যারা সভ্যতার পার্থিব মানে প্রবেশ করেছে ধাতুযুগে। এদের ঘিরে চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজ যারা তখনও কৃষি যুগের মানুষ। তারও চারপাশে উত্তর ইউরোপ, এশিয়া ও অধিকাংশ আফ্রিকায় তখন আধা সভ্য মানুষ, নিতান্ত পশুশিকারী—অগ্রগতির মান সর্বত্র সমান ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতিতেও এই অসমতা দেখা গেছে। ৮০০০ খৃ. পূ.-র আগে মানুষ যুক্তি পারম্পর্য ও প্রকৃত নিয়মাবদ্ধ চিন্তা-প্রণালী অর্জন করতে পারে নি। সে চেষ্টা করেছে, ভুল করেছে, আবার চেষ্টা করেছে। ইচ্ছা, ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও বুদ্ধির মিলনে সাফল্য এসেছে। বৈজ্ঞানিক সাফল্যের এটিই মূল মন্ত্র।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি

বিজ্ঞান পদ্ধতি বলতে বিজ্ঞানের আঙ্গিক, শৈলীর যে ধারণায় প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও অন্যান্য প্রভাব-নিরপেক্ষ এক বিমূর্ততা আছে। পূর্বতন আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান সাফল্যের সংযোজনে এই পদ্ধতি এক সংযোজনপ্রবণ, ক্রমপুঞ্জিত পদ্ধতি। একাধিক প্রক্রিয়ার, যার কিছু মানসিক, কিছু কায়িক, সংযোজনে সম্মেলনে ও গুণনে এই পদ্ধতি চূড়ান্ত রূপ পায়। প্রথমে বিজ্ঞান কোন্ সমস্ত প্রশ্ন/প্রসঙ্গের উত্তর/সমাধান জানা প্রয়োজন তা ঠিক করে। তারপর ওই সব প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কারের, পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণের ও বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান-পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত তাই প্রায়োগিক যা প্রথমে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে, তারপরে রসায়ন ও জীববিদ্যায় এবং সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক শুধু যুক্তি নয় কিছুটা স্বজ্ঞা দ্বারাও পরিচালিত।

এখানে যুক্তি ও স্বজ্ঞা বিষয়ে কিছু বলা দরকার। এই বাক্যটি ধরা যাক—বারো মাস তুষার জমে থাকে যে সুদূর উত্তরে সেখানে সাদা ভালুক পাওয়া যায়—এর যুক্তি-অংশ (logical clause) বারো মাস তুষার জমে থাকায়। আবার, খরা বন্যা বা অব্যবস্থার দরুণ অপর্যাপ্ত ফসল হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—এই বাক্যের logical clause অপর্যাপ্ত ফসল হওয়ায়। কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তিই সব নয়, বর্ষাকাল, আকাশে ঘন কালো মেঘ করেছে, সুতরাং বৃষ্টি হবে—এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে যুক্তি ছাড়াও অভিজ্ঞতা ও সহজ প্রবৃত্তিরও দরকার পড়েছে; একে বলব স্বজ্ঞা। পাস্কাল বলেছিলেন যুক্তি, কল্পনা অভ্যাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এমনিতেই কিছুটা নির্ভরশীল। যুক্তি ও স্বজ্ঞার ভিতর নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখতে পারাই পরিমিতিবোধ, বিজ্ঞানের গবেষণায় যার সূক্ষ্ম ভূমিকা রয়েছে। যুক্তি-প্রণালীকে এরপর আমরা অবরোহী ও আরোহী এই দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারব। অবরোহী (বা deductive) পদ্ধতি হল স্বীকৃত তত্ত্ব থেকে নতুনতর সিদ্ধান্তে বা প্রয়োগে আসার প্রণালী আর আরোহী (বা inductive) পদ্ধতি হল সংগৃহীত তথ্য থেকে সেই তথ্যের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে এমন কোন সমর্থক তত্ত্বে উপনীত হওয়া। বিজ্ঞানে দুই ধরনের যুক্তি-প্রণালীরই প্রয়োজন রয়েছে। জীবনে অবশ্য কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের জন্যও টান জাগে আমাদের, খুব মৃদু মাত্রার হলে যার প্রতি সামাজিক সমর্থনও থেকে যায়। যায় বলেই দুই দল লোকের মারামারি ঠেকানো পুলিশের কাজ কিন্তু দুই দল খেলোয়াড়ের মারামারি ঠেকানো রেফারির কাজ। কিম্বা একটা ত্রিশ টাকার চেককে একশো ত্রিশ টাকার চেক বানালে তা হয় জালিয়াতি কিন্তু ত্রিশ টাকা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর একশো ত্রিশ টাকা ভ্রমণ ভাতা নিলে বড় জোর তা হয় অনৈতিক।[৭]

বিজ্ঞান-পদ্ধতির উপাদানগুলি নিয়ে এইবার আলোচনা করব।

১. পর্যবেক্ষণ: বিজ্ঞানের শুরু পর্যবেক্ষণ দিয়ে। অবশ্য কী পর্যবেক্ষণ করবে ও কীভাবে করবে বিজ্ঞানীকে তা জানতে হবে।

শিল্পীর সঙ্গে এ ব্যাপারে তার পার্থক্য এই যে শিল্পীর পর্যবেক্ষণ রূপান্তরের জন্য, শিল্পী যা দেখেন অন্যকে তা দেখান, আর বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ বিশেষ কোন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে, তিনি খুঁজে দেখেন, ও তারপর তা পরীক্ষায় প্রয়োগ করেন।

২. শ্রেণীবিভাগ ও পরিমাপন : পর্যবেক্ষণকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া পরের কাজ। পর্যবেক্ষণের নিয়মবদ্ধ পরিমাপ যেমন শ্রেণীবিভাগেও সাহায্য করে তেমনি এই সাজাবার পদ্ধতিকে আর এক ধাপ এগিয়েও দেয়। পরিমাপন বিজ্ঞানকে এক দিকে গণিতের সঙ্গে ও অন্যদিকে প্রয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

৩. পরীক্ষা নিরীক্ষা : শ্রেণীবদ্ধ পর্যবেক্ষণকে নানান্ পরীক্ষার (Test, trial) মাধ্যমে বাজিয়ে দেখা ও প্রমাণ সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে এই পর্যায়টি শুরু হয় যা একটি দ্বিস্তর পদ্ধতি—এককে বিশ্লিষ্ট করে বহু উপাদানে পৃথক করা ও বহুকে সংশ্লিষ্ট করে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া। এই কাজের জন্য দরকার হয়

৪. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (Apparatus) : একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণের জন্য সহজ ও জটিল, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অসংখ্য যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে। এদের দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ব্যবহার্য ও সাধারণ হাতিয়ারকেই বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা এবং বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্র ব্যবহার করা। এই বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রও অনেক সময় কয়েক বছর পর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য সামগ্রী হয়ে ওঠে। যেমন ক্যাথোড-রশ্মি-টিউব থেকে আজকের টেলিভিশন।

৫. নিয়ম, প্রকল্প, সিদ্ধান্ত : বা Law, Hypothesis, Theory. এই অংশটি হল বিজ্ঞানের বিচারধর্মী ও বিচারসিদ্ধ অংশ। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্ম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সংখ্যায় অজস্র ও পরিমাণে অপরিসীম হয়ে উঠবে, স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের ধারা ও ধরন অনুসারে যুক্ত করা, শ্রেণীবিভক্ত করা ও তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নির্ধারণ করা না হলে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ কাজে

লাগবে না। সুতরাং বিজ্ঞানের আপাতত চূড়ান্ত তত্ত্বগুলির রূপ দেওয়া সম্পন্ন করতে হচ্ছেই। এই তত্ত্বকে তারপর প্রয়োগ করতে হচ্ছে বাস্তবে, যা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক। যদি বাস্তবে তা প্রযুক্ত হয় তবে তার পর্যবেক্ষণ ও যদি না হয় তবে ফের নতুন পর্যবেক্ষণ, নতুন পরীক্ষা, নতুন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটি সর্বদাই সচল।

৬. বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : পরীক্ষা, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ নিয়ে বিজ্ঞান। ব্যাখ্যা অংশটি মূলত তাত্ত্বিক, পরীক্ষা ও প্রয়োগের ফলাফল লিপিবদ্ধ করার কাজে ভাষার প্রয়োজন। ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অন্যান্য ধ্যানধারণা প্রকাশযোগ্য করার জন্য যে ভাষা তা-ই হল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বিজ্ঞানচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ তা। যদিও এই ভাষা বিশেষজ্ঞের ভাষা তবু বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রগতির সাথে সাথে তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষাতে অনুপ্রবেশ করে, সংস্কৃতির উপর যার প্রভাব লক্ষণীয়।

এ সমস্তই বিজ্ঞানের উপাদান। এরই সঙ্গে আসবে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা যে কোন্ কোন্ প্রশ্ন / সমস্যাকে বিজ্ঞান উত্তর / সমাধান জানার জন্য নির্বাচন করবে ও নির্বাচনের বিন্যাসটি কী রকম হবে। অপরিহার্য ও সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করা যেন তাদের উত্তর বা সমাধান আবিষ্কারের চেয়েও কিছু বেশি কঠিন কেননা প্রথম কাজে শুধু বিজ্ঞানে অধিকার নয়, সমাজ-বিজ্ঞানে দখল থাকারও প্রয়োজন হচ্ছে। দরকার পড়ছে দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও সমাজসচেতনতার। সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরের বহু বিজ্ঞানী আজও এই প্রশ্ন বাছাই ও তার সমাধানে ব্যক্তিগত পছন্দ বা পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ইচ্ছা ও আদেশকে অবলম্বন করে থাকেন। একেবারে জাত বিজ্ঞানী না হলে ব্যক্তিগত পছন্দ সমৃদ্ধ হবেই বলা যায় না ও প্রতিষ্ঠান বা সরকারও নিশ্চয়ই সমাজের বিকল্প নয়। ফলে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন। যেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের তথ্য ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কারণে ঢোকার দরকার হবে।

বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সংযোজনপ্রবণতা

বিজ্ঞান সংযোজনপ্রবণ, আগেই বলেছি। অন্যান্য সামাজিক সাফল্য ও মানবিক প্রয়াস থেকে বিজ্ঞান এইখানে আলাদা। বিজ্ঞানীর হাতের কাছে সব সময়েই থাকছে পূর্বতন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশলের এক ক্রমবর্দ্ধিত বিশাল ভাণ্ডার অসংখ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও আবিষ্কারের রূপকল্প ও প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে যা পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্তিত হয়ে উঠছে। পূর্বতন আবিষ্কারের ফলাফল আধুনিক বিজ্ঞানে গৃহীত হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে ও প্রাচীন প্রয়োগ ব্যবহার ও সাধারণ স্মৃতি থেকে সরে যাচ্ছে। শিল্পের ঐতিহ্য হল অনুভবের, আনন্দের, মননের, বিশুদ্ধ যুক্তির অভ্রান্ত সমর্থন সেখানে অনিবার্য নয়। কিন্তু বিজ্ঞানকে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে ব্যবহারিক হতেই হবে, তাকে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে জড় পর্যায়ে (যেমন ভৌত বিজ্ঞান), জীব পর্যায়ে (যেমন জীববিজ্ঞান) ও মানব সমাজে (যেমন সমাজ বিজ্ঞান)। আহৃত তথ্য ও তত্ত্বের যথাযথ বর্ণনায়, শুধুই বিবরণে, বিজ্ঞানের চলে না, তাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত হতে হয় ও ঐ প্রয়োগে অহরহ উন্নতিও ঘটাতে হয়। ঐ ব্যবহারিক দিকটি থাকে বলে বিজ্ঞান আরও বেশি সংযোজনপ্রবণ। টেকনিক হল সিঁড়ির মত। নতুন ধাপে ওঠার জন্য ওঠার আগে পর্যন্ত পুরনো ধাপের ওপর নির্ভর করে থাকা।

প্রারম্ভিক বিজ্ঞান ঃ শ্রেণী প্রসঙ্গ, শ্রেণী চরিত্র

বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল স্বল্প সংখ্যক দক্ষ কারিগরের জীবিকা হিশেবে, তা ছিল পেশাদারী ও সামান্য লোকের চর্চার মধ্যে আবদ্ধ। শহরের পত্তন হতে দেখা গেল লিখন ও গণনার প্রতি কারও কারও

আগ্রহ জন্মাচ্ছে, তাদের আকর্ষণ গবেষণা ও প্রতীতির দিকে, তারা কারিগর মাত্র না থেকে হয়ে উঠল তাত্ত্বিক, যাদের ধরা হত উঁচু প্রজাতির বিজ্ঞানী রূপে। কারিগর ও বিজ্ঞানীর ভিতর তারতম্য করা শুরু হল। এমনিতে বিজ্ঞানের প্রতিটি পর্যায় বা যুগকে নতুন কোন কলাকৌশলের (material technique) আবির্ভাব ও প্রভাবের মাধ্যমে নামাঙ্কিত করা হয়েছে—প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, বিদ্যুতের যুগ, পরমাণু যুগ, মহাকাশ যুগ ইত্যাদি ; যে টেকনিক বলতে বোঝানো হয় ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় আহৃত এবং বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কোন কর্ম-পদ্ধতি ও কলাকৌশলকে—তবু প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যার প্রতি একটু বাঁকা চোখে তাকানোর অভ্যাস বহু দিনের।

যাই হোক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই ছিল সামান্য লোকের চর্চা ও বিশেষ কিছু লোকের বিদ্যা। তাদের দক্ষতার দরুণ ও এই দক্ষতার পেশাদারী সাফল্যের দরুণ এই বিশেষ কিছু লোক ছিল উঁচু শ্রেণীর মানুষ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিপত্তি, দু দিক থেকেই। যন্ত্র বিপ্লবের সময়ের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানকে দেখি উঁচু শ্রেণীর মানুষের ভিতর পুরোপুরি আবদ্ধ, ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি-প্রণালীর সঙ্গে যাদের যোগাযোগ নিতান্ত ক্ষীণ, ফলে সমাধানের জন্য সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা (বিজ্ঞানীরা) নিজেরাই পড়ত সমস্যায়। শাসক শ্রেণীর ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সংযোগ ও তাদের স্বার্থের প্রতি বিজ্ঞানের বিশেষ মনোযোগের কারণে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-বিন্যাসের প্রথম দিনটি থেকেই সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানের জন্য মনোভাব গভীর সন্দেহের। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আদি বিজ্ঞানীরা ছিল যাদুকর, অপরিসীম দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাকের নিয়ন্ত্রক ও চালক যারা ; ফলে বিজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক প্রতীতি সমূহের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই সব যাদুকরের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলে তারা ও পুরোহিতরা এই রকম বিশ্লেষণের প্রচেষ্টাকে সর্বোতোভাবে বাধা দিত, ফলে বিজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ থাকা, তাও স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানের মূল্যায়নে আমরা বিশ্লেষণের দুটি পৃথক ধারা দেখতে পাই, একটি ভাববাদী, অন্যটি বস্তুবাদী। ভাববাদী বিজ্ঞানচিন্তা বস্তুর শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। আর বস্তুবাদী বিজ্ঞানচিন্তা বস্তুসমূহ, তাদের গতি / প্রগতি ও তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। ভাববাদ সমাজ ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে ওপর থেকে, বস্তুবাদ ব্যাখ্যা জোগায় নিচে নেমে এসে। বস্তুবাদ, বিশেষত মার্কসীয় বস্তুবাদ মনে করে ইতিহাসের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ হবে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে ও মাধ্যমে। কী সামাজিক পরিবর্তন কী রাজনৈতিক বিপ্লব কী শিল্প-প্রগতি সব কিছুরই প্রাথমিক উৎস নিছক ভাবনা নয়, প্রত্যক্ষ অর্থনীতি। তাই লৌহযুগে এসে আমরা যখন দেখি আকরিক লোহার প্রাচুর্যের দরুণ লোহা দামে সস্তা বলে লৌহ অস্ত্র ও হাতিয়ার শুধু উচ্চবিত্তের মানুষকে নয়, অন্যদের হাতেও তুলে দেওয়া যাচ্ছে, আমরা বলি লোহার আবিষ্কার গণতন্ত্রকে সুগম করেছে। গ্রীক সভ্যতার অগ্রগতির একটা মূল কারণ ছিল তাদের সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামো। তারা অবশ্য প্রয়োগ ও ব্যবহারের চাইতে বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিকে বেশি নজর দিয়েছিল, প্রকৃতিকে কাজে লাগাবার চেয়ে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বেশি, যেজন্য গ্রীক সভ্যতা বিরাট কোন কারিগরী আবিষ্কারের কৃতিত্ব পায় নি।[৮]

বিজ্ঞানের শ্রেণী চরিত্র বিচারে দেখি যন্ত্রবিপ্লবের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে শাসক শ্রেণীর যোগ ছিল স্পষ্ট। ধর্ম, শাসক ও শোষিতের ভিতর এইভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখতেও প্রথম থেকেই সচেষ্ট হয়েছে। ফলে নগর সভ্যতার পত্তনের কয়েক শতক পরে শাসক শ্রেণী যখন পার্থিব ও প্রাযুক্তিক উন্নতির বিরোধিতা আরম্ভ করল ধর্মও শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বাধা দিতে বাধ্য হল। সব মিলিয়ে বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলটি সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। উচ্চ বিত্তের লোকেরা আবার বিজ্ঞানকে অভিজাত বিজ্ঞান ও ব্রাত্য বিজ্ঞান, এই দুই ভাগে

ভাগ করে নিল। গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গীত—এই ছিল উচ্চশিক্ষার পাঠ্যবিষয়, এমনকি মধ্য যুগেও, তার পরেও। সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য রসায়ন ও জীববিদ্যাকে দরবার করতে হয়েছে সেদিন পর্যন্ত, সাধারণকে বিশ্বস্ত করার পক্ষে সবই ছিল প্রতিকূল। সমাজতান্ত্রিক জগতের বাইরে অন্য বহু দেশে বিজ্ঞান আজও সাধারণ মানুষের সন্দেহ ও বিদগ্ধ মানুষদের তিরস্কারের দায়ভাগ বয়ে থাকে, বিজ্ঞানের এ এক ট্রাজেডি।

বিজ্ঞানের বিস্তার

প্রারম্ভিক বিজ্ঞানের ঠিক পরবর্তী কালের প্রধান চার অবদান যথাক্রমে: ভগ্নাংশ (২০০০ খৃ. পূ.), লোহার গলন (১৪০০ খৃ. পূ.), প্রকৃত সুসম্বদ্ধ লিখন প্রণালী (১৩০০ খৃ. পূ.) ও শহরাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য সেচনালা (৭০০ খৃ. পূ.)—যার দুটি কারিগরী বিজ্ঞানের, দুটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভ্যুদয়ের বিন্যাসটি—গণিত, জ্যোতিষ, যন্ত্রবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান—কারিগরী বিজ্ঞানের নিজস্ব বিন্যাসের—যার শুরু সমাজ গঠন দিয়ে—প্রায় বিপ্রতীপ। বিপরীত না লিখে বিপ্রতীপ কেন লিখছি নিচের উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। মিশরীয় ভূমি আধিকারিকরা তাদের মাপজোখের কাজে সুবিধার জন্য সমকোণ গঠনের একটি পদ্ধতি আকস্মিক আবিষ্কার করে: একটি লম্বা দড়িকে বারোটি সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে তিন ভাগে প্রথম বাহু, চার ভাগে দ্বিতীয় বাহু ও শেষ পাঁচ ভাগে তৃতীয় বাহু গঠন করে নির্মিত ত্রিভুজের প্রথম দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণটি সমকোণ হয়। নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া এই আবিষ্কারের বিষয়ে তারা আর কোন আগ্রহ দেখায়নি। গ্রীকরা কিন্তু এইভাবে একটি ত্রিভুজ গঠন করলে কেন একটা সমকোণ পাওয়া যায় তা ভাবতে থাকে ও সঠিক

সিদ্ধান্তে আসে যে উদাহরণটি ত্রিকোণ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরলরেখার একটি বিশেষ ধর্মের প্রমাণ মাত্র—সমান বারো ভাগে ভাগ করা ছাড়াও এটি সম্ভব। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ, নিয়মাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ, মিশরীয়দের আয়ত্তে থাকলেও, দ্বিতীয় ধাপ—বিমূর্তীকরণ ও সামান্যীকরণ, যার সাহায্যে সদৃশ সমস্যাগুলির সদৃশ সমাধান সম্ভব—গ্রীকদের অবদান। যা ছিল গ্রীকদের জ্যামিতিতে বিশেষ সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বিজ্ঞানের এই বিস্তারের পাশাপাশিই মানুষের ইন্দ্রিয়স্থান আরও জটিল ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছিল। তার স্নায়ুতন্ত্র ক্রমেই হয়ে উঠল আরও সংবেদনশীল। ইন্দ্রিয়স্থান যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করত স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে তাকে সঞ্চিত রাখা ও তার বিশ্লেষণ জোগানো সম্ভব হল। মানুষের ইন্দ্রিয়স্থান ও চালনস্থান যুগ্ম সক্রিয়তায় যে অনুভব ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করল এখন বিজ্ঞানের কাজ হল তার সচেতন বিস্তার ও সচেতন প্রয়োগে মনোযোগ দেওয়া। প্রয়োগ কলা ছিল নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ললিতকলা এল অবসর বিনোদন ও নান্দনিক চেতনা থেকে। শিল্প একই সঙ্গে মানুষের কায়িক ক্ষমতাকেও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করিয়ে নিল আবার তার সৌন্দর্যবোধেরও প্রতিফলন ঘটাল। সভ্যতার বিস্তার ও সূক্ষ্মতার এই সময়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা তার দেশগত কালগত ও বিষয়গত ইতিহাসের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এইবার মেপে দেখব, যে বর্ণনায় আমরা অতীত সম্পর্কে মোহান্ধও হব না, উন্নাসিকও হব না। মনে রাখব বিজ্ঞানের ইতিহাস শুধু বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ স্মৃতিকথাই নয়, তার পরীক্ষা নিরীক্ষার তাত্ত্বিক গবেষণাগারও।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ইতিহাস ঃ দেশগত

মিশর ঃ

শুরুতে (৪৪৪০ খৃ. পূ.) মিশরীয় সভ্যতা ছিল দুটি পৃথক সাম্রাজ্যে বিভক্ত যার প্রাথমিক ইতিহাস বিদেশী আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও গৃহযুদ্ধের। দেশের জন-অধ্যুষিত এলাকাটি আকারে ছিল মানুষের মেরুদণ্ডের মত, সরু ও লম্বা ; নীল নদীকে মাঝখানে রেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছয়শো মাইল দীর্ঘ ও অনতিপ্রশস্ত এক অববাহিত অঞ্চল। অসংখ্য দেহকোষের মত অসংখ্য কৃষি এলাকায় বিভক্ত তা। এই সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ফলপ্রদ যুগটি হল প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগ (২৭৭৮-২২৬৩ খৃ. পূ.) যে সময়ে সাক্কার ও গীজার প্রখ্যাত পিরামিডগুলিই শুধু নির্মিত হয় নি, এছাড়াও, মৃৎশিল্পের সূচনা হয়েছে, ধর্মীয় মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছে, গণিত জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নানান্ আবিষ্কার দেখা গেছে।

গণিত

গণনার দশমিক পদ্ধতি প্রথম থেকেই মিশরীয়দের জানা ছিল। এই পদ্ধতিতে দশ লক্ষ পর্যন্ত দশের প্রতিটি ঘাতের জন্য তারা বিশেষ ও পৃথক চিহ্ন নির্দিষ্ট করে, যদিও শূন্য (০) সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। এই পদ্ধতি পরবর্তী কালে আরবদের কাছ থেকে আরও উন্নত পদ্ধতি আয়ত্ত না করা পর্যন্ত প্রচলিত থেকেছে। অসংখ্য কৃষিক্ষেত্রে বিভক্ত মিশরের সমস্ত জমিই ছিল রাজার বা রাজার প্রতিনিধি হিশেবে স্থানীয় পুরোহিতদের। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এই

দেশের সুশাসনের জন্য শাসকদের দরকার হত দেশের কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে একটি সঠিক ধারণার ও সেই সম্পদকে যোগ্যভাবে ব্যবহার করার। মিশরের তাই বিশাল ও জাতীয় এক হিশাব-রক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছে, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের যে সীমারেখা ছাড়িয়ে মিশরীয় বিজ্ঞান বৃহত্তর সাফল্যে কোনদিনই উত্তীর্ণ হতে পারে নি। এমনকি, যোগ ও বিয়োগ চিহ্নও তাদের ছিল না, ছিল না খুব সমৃদ্ধ কোন পরিমাপ ও ওজনপ্রণালীও। পরিমাপের উল্লেখ করা হত প্রথমে যে একক ব্যবহার করা হচ্ছে তার নাম লিখে ও তারপর যতগুলি ওই একক লাগছে তার সংখ্যা দিয়ে। তাদের পাটিগণিত ছিল মোটের উপর যোগ-নির্ভর, ২-র বেশি কোন সংখ্যা দিয়ে তারা সরাসরি গুণ করতে পারত না ; যোগফলের মাধ্যমে করত। যেমন ১৩কে ৮ দিয়ে গুণ করার সময়ে তারা ৮ কে ১ দিয়ে গুণ করত=৮ গুণফলকে অর্থাৎ ৮কে ২ দিয়ে গুণ করত=১৬, গুণফলকে আবার ২ দিয়ে (অর্থাৎ ৮কে ৪ দিয়ে গুণ করত)=৩২, গুণফলকে আবার ২ দিয়ে (অর্থাৎ ৮কে ৮ দিয়ে গুণ করত)=৬৪। এখন ১৩= ১+৪+৮ ফলে ১৩×৮=১ দিয়ে ৮কে গুণ করার ফল+৪ দিয়ে ৮কে গুণ করার ফল+৮ দিয়ে ৮কে গুণ করার ফল= ৮+৩২+৬৪=১০৪। ভাগ করা হত এই পদ্ধতিই বিপরীত ভাবে প্রয়োগ করে। যেমন ১৭৬কে ৮ দিয়ে ভাগ করার সময়ে তারা ৮কে প্রথম গুণ করত : ৮×১=৮, ৮×২=১৬, ১৬×২ (অর্থাৎ ৮×৪)=৩২, ৩২×২ (অর্থাৎ ৮×৮)=৬৪, ৬৪×২ (অর্থাৎ ৮×১৬)=১২৮। এখন ১৭৬=১২৮+৩২+১৬, অতএব ১৭৬কে ৮ দিয়ে ভাগ করার ফল=১৬+৪+২=২২। এই পাটিগণিত স্পষ্টতই সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ। দেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, ফলে রাষ্ট্র বা মন্দির কর্তৃক সংগৃহীত শস্য জনগণের মধ্যে ভাগ করে দিতে হত, যে কাজে ভগ্নাংশ এসে পড়তই। এইভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ভগ্নাংশের কথা জানতে হয়েছে। ⅔ ছাড়া আর যে সব ভগ্নাংশের ব্যবহার তারা জানত তা সমস্তই ১-র

বিভাজন-জনিত যেমন $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{৬}$ ইত্যাদি। ফলে $\frac{২}{৫}$ কে তারা লিখত এইভাবে, $\frac{১}{৩}+\frac{১}{১৫}$। $\frac{১}{৫}+\frac{১}{৫}$ না লিখে এটা লেখার অর্থ এই যে ভগ্নাংশ বিষয়ে তাদের বিশুদ্ধ ধারণা ছিল না। $\frac{২}{৫}$ থেকে $\frac{২}{১০১}$ পর্যন্ত এইভাবে ভগ্নাংশ লেখার একটা তালিকাও তারা তৈরি করে, যেমন $\frac{২}{৪১}=\frac{১}{২৪}+\frac{১}{২৪৬}+\frac{১}{৩২৮}$, খুবই কষ্টসাধ্য এক তালিকা। বর্গ ও বর্গমূল-করণ এবং সহজ সমান্তর ও গুণান্তর শ্রেণী সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল কিন্তু তা কোন বিশুদ্ধ গাণিতিক ধারণা নয়, অভিজ্ঞতা বলে আহৃত আকস্মিক প্রাপ্তি। বীজগণিতের সমস্যারও তারা এইভাবে সমাধান করত, হয় লেখচিত্রের সাহায্যে নয়তো সম্ভাব্য উত্তর পরীক্ষা করে করে কোন্‌টা সঠিক খুঁজে বের করে। বীজগাণিতিক কোন বিমূর্ত চিহ্ন ও প্রতীক তাদের ছিল না, অনেক পরে ভারতবর্ষ থেকে এই বিষয়ে তারা জানতে পেরেছে। মিশরের জ্যামিতিও ছিল অনুরূপ, যত না গাণিতিক তার চেয়ে বেশি সারগ্রাহী। বিশাল পিরামিডগুলির স্থপতিদের অপরিহার্য তথ্যের জোগান দিতে গিয়ে ও জরিপের কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজনে এই জ্যামিতির উৎপত্তি। কালক্রমে আয়তক্ষেত্র, ট্র্যাপিজিয়ম ও সম্ভবত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়, বৃত্তের ক্ষেত্রফল বেশ বিশুদ্ধির সঙ্গে অনুমান করা, π এর মান ৩˙১৬০৫ হিশেবে নির্ধারণ, এবং ঘনফল, পিরামিড ও বেলনাকার বস্তুর আয়তন নির্ণয়ে তারা সক্ষম হয়। মিশরীয়রা এগুলি নির্ধারণ করেছে কোন যুক্তি বা সূত্রের সাহায্যে নয়, সম্ভাব্য উত্তর পরখ করে করে। বস্তুত পাটিগণিত ছাড়া গণিতের অন্য কোন শাখাতে তাদের অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। ত্রিকোণমিতি বোঝার প্রাথমিক চেষ্টাটুকু তারা করেছিল এই বলে গণিতে ইতি টানছি।

জ্যোতিষ

গ্রীকদের রচনা থেকে জানা যায় মিশরীয়রাই প্রথম বৎসরের কল্পনা করে এবং তাকে বারোটি সমানভাগে ও ৩৬৫ দিনে বিভক্ত করে।

একটি বছর ছিল তিন ঋতুতে সম্পূর্ণ—নীল নদে প্লাবনের ঋতু, শীত ও গ্রীষ্ম। বর্ষগণনা শুরু হত যেদিন সূর্যোদয়ের সময় আকাশে লুব্ধককে উদিত দেখা যেত সেই তারিখ অর্থাৎ এখনকার ১৯শে জুলাই থেকে। ধারাবাহিক সন গণনার কোন প্রচলন ছিল না, প্রতি বছরই ৩৬৫ দিনের, লীপ ইয়ারও ছিল না। তাই মিশরীয় বর্ষ ও জ্যোতির্বর্ষর মধ্যে প্রতি ৪ বছরে ১ দিন বা প্রতি ১২০ বছরে ১ মাসের পার্থক্য দেখা দিত। কালক্রমে, প্রকৃতিতে আসলে যখন শীতকাল মিশরীয় বর্ষ অনুসারে তখন ঘোর গ্রীষ্ম, এমন হত। মিশরের প্রাচীন প্যাপিরাসে বা কফিনের ঢাকনায় বৃত্তাকার বর্ষপঞ্জী, চাঁদের ষোল কলা ইত্যাদির কথা আছে কিন্তু গ্রহণের উল্লেখ নেই। মিশরীয়রা দিক নির্ণয় করেছে এই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যে ক্ষুদ্রতম ছায়া সর্বদাই উত্তরমুখী, পিরামিড নির্মাণের সময় এভাবে তারা উত্তর বিন্দু চিহ্নিত করতে পেরেছে। মহাকাশের অনেক গ্রহ তারা ও নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা তাদের জানা ও নামকরণ করা ছিল কিন্তু রাশিচক্রের বারোটি পৃথক প্রতীকের বিষয়ে গ্রীক সভ্যতার বিকাশের আগে তারা কিছু জানত না। বহু তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় ও অস্তের সময় তারা লক্ষ্য করেছিল কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নির্ভুল হত না। কয়েকটি জ্যোতিষ-যন্ত্র, সূর্য-ঘড়ি ও ছায়া-ঘড়ির কথা প্যাপিরাস থেকে জানা যায় যেগুলি খুব সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ছিল না, গণনার মানে প্রায়ই ত্রুটি থাকত। এই দুর্বলতা স্বাভাবিক কেননা মিশরীয় জ্যোতিষ ছিল চরিত্রে মোটের ওপর আচার-আনুষ্ঠানিক ঃ পুরোহিতদের একটা দলের কাজ কখন শেষ হবার সময় হবে, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব কবে ও কোন সময়ে অনুষ্ঠিতব্য, মৃত ব্যক্তিদের পারলৌকিক যাত্রায় কখন শুভযোগ, কখন অশুভ, ইত্যাদি।

চিকিৎসাশাস্ত্র

বিষয় ধরন ও উপস্থাপনায় মিশর থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসাবিষয়ক প্যাপিরাসগুলি বিভিন্ন ও বিচিত্র রকম হলেও মূলত নিদানমূলক। শল্য

সংক্রান্ত আলোচনাও কম নয়। এই সব বৈজ্ঞানিক ও অংশত বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি রয়েছে, থাকত নানান্ তন্ত্রমন্ত্রও। বিছার কামড়ের কোন ওষুধ ছিল না, ওষুধ দেওয়া হত না, দেবতার দয়ায় যদি সারে তো সারল। যাদুকর ও চিকিৎসকরা একই সঙ্গে কাজ করত, ক্ষতে মলম লাগাত কিন্তু তার আগে হত মন্ত্রপাঠ। কেউ কেউ আবার ছিল যাদু ও চিকিৎসা দুই বিদ্যাতেই পারদর্শী। যদিও চিকিৎসকরা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মী চিকিৎসাবিদ্যা সঞ্চারিত হত বংশানুক্রমে, পরিবারের লোকদের বাইরে যেত না। মিশরীয় চিকিৎসকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তারা ছিল বিভিন্ন রোগে বিশেষজ্ঞ। হৃৎপিণ্ডকে মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে তারা মনে করেছে, তাদের ধারণা ছিল হৃদয় থেকে নির্গত দুটি নালী প্রস্রাবকে সরাসরি মূত্রাশয়ে প্রেরণ করে, কিডনির কথা পুরোপুরি অজানা ছিল। কাশ, পাকাশয়ের রোগ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র ও মূত্রাশয়ের বিভিন্ন অসুখের প্রতিষেধক প্যাপিরাসে উল্লিখিত আছে। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের চেয়ে বহিরঙ্গের বিষয়ে মিশরীয়দের অধিক ধারণা ছিল। দাঁত ও মাড়ির নানা রকম চিকিৎসা, চোখের প্রাথমিক রোগ নিরাময়, স্ত্রী অঙ্গের শুশ্রূষা প্রভৃতির প্রচলন থাকলেও চোখের অন্তর্গঠন, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া, নারীরোগের চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রয়াস প্রায়ই ছিল আদিম ও তন্ত্রসুলভ। মিশরীয়রা প্রধানত ছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। মানবশিশুর জন্মের আনুপাঙ্কিক বর্ণনা দিয়ে তারা যখন দেয়াল-শিল্প আঁকছে শল্যচিকিৎসায় গ্রীকরা তখন চোখের ছানি অপসারণ করেছে। মিশরের শল্যচিকিৎসকরাও অবশ্য খুবই কৃতিত্বের অংশীদার। অস্থিক্ষত ও অস্থিশল্য দুই ব্যাপারেই তারা নিতান্ত সফল। তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল যথেষ্ট সৃজনশীল। ক্ষতস্থান সেলাই ও ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে কাঠের টুকরোর ব্যবহার তারাই প্রথম করেছে। মিশরের ভেষজবিজ্ঞান প্রথমত দেশের গাছগাছড়া ও দ্বিতীয়ত জীবসর্গ ও খনিজ দ্রব্য থেকে আহৃত। এর কিছু কিছু আজও ফলপ্রদ, অধিকাংশ তখনই বিফল। যাদুর উপর অত্যধিক নির্ভরতা যার কারণ।

এইভাবে আলকেমির আদি উৎপত্তি মিশরীয়দের হাত দিয়ে। চিকিৎসার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পুরোপুরি অনুসারী হতে গিয়ে মিশরীয় চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয়ে ও রোগ নিরাময়ে বস্তুত ২৮০০খৃ. পূ.-এর আদি পদ্ধতিকেই সর্বদা অনুকরণ করে গেছে।

সমাপ্তিতে বলা যায়, খৃ. পূ. ৫ম শতকের গ্রীক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে মিশরীয় বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের স্বল্পতায় এবং আধিবিদ্যক ধারণার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে, মূলত পর্যবেক্ষণ-নির্ভর কিছু কলাকৌশল ও পদ্ধতির বর্ণনা; সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়। তবু গ্রীকরা মিশরীয়দের কাছ থেকে পর্যাপ্ত ভাবে গ্রহণ করেছে, গ্রীক বিজ্ঞানীরা —হেকাটেয়াস, হেরোডোটাস, হিপোক্রেটস, ডিয়োস্করিড, গ্যালেন— মিশর পরিভ্রমণ করেছেন, মিশরের গ্রন্থাগার; সেখানে অধ্যয়ন করেছেন মিশরীয় বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে গ্রীক সভ্যতা আর গ্রীকদের সাহায্য করেছে মিশরীয় সভ্যতা— মিশরের এই হল অবদান। আর তার শিল্প ও স্থাপত্য তো বিশ্বজয়ী। আর মামি (মৃতদেহ সংরক্ষণ)—তা সাফল্যের এক রহস্যজনক অধ্যায়!

আরব ও ঐশ্লামিক বিজ্ঞান

নীল নদ অববাহিত মিশরীয় সভ্যতা ছিল বর্তমানের আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকাকে এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে লোহিত সাগর। এই সাগরের কাছে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে আমরা এখন যাকে বলি আরব রাষ্ট্রসমূহ সেইখানে খৃষ্টীয় ৫৭০ অব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়। ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ঐশ্লামিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান গড়ে উঠতে সুরু করে। মিশরের কাছাকাছি আরব অঞ্চলের ওই সভ্যতা বয়সে ঢের আধুনিক, যার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উল্লেখ চতুর্থ পরিচ্ছেদ (কালগত ইতিহাস)-এর অন্তর্ভুক্ত।

মিশরীয় সভ্যতার বিবরণে যেমন প্যাপিরাসের উপর নির্ভর করতে হয়, মেসোপটেমীয় সভ্যতার বর্ণনায় তেমনি মৃৎলিপির প্রয়োজন। মেসোপটেমীয় সভ্যতার সূচনা খৃ. পূ. ৩৫০০ বছরেরও আগে, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায়। প্রারম্ভে সুমেরীয়দের কৃতিত্বে সমৃদ্ধ ও পরে বহু উপজাতির মিশ্রণে পুষ্ট, খৃষ্টীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেসোপটেমীয় সভ্যতার গঠনধারা খুবই জটিল। সমস্ত জটিলতার মধ্য দিয়ে যা স্পষ্ট তা এই যে নতুন নতুন যাযাবর জাতির আগমনে কালক্রমে জনসংখ্যায় সুমেরীয়রা সংখ্যালঘু হয়ে গেলেও তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল বহুদিন পর্যন্ত। ২০০০ খৃ. পূ. থেকে ১৭০০ খৃ. পূ. পর্যন্ত সময়টি ছিল এই সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এই সময়ে এই সভ্যতা ব্যাবিলন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ও আসিরিয়াতেও এর প্রভাব বিস্তার করে। খৃ. পূ. ১৬৫০ নাগাদ আদি আর্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস কার্যত ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসে পর্যবসিত হয় এবং খৃ. পূ. সপ্তম শতকে আসিরিয়া তার আধিপত্য চূড়ান্ত করে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে সুমেরীয়দের আবিষ্কার ও অবদানগুলিকে লিপিবদ্ধ ও সম্পাদনা করা এবং তাদের অনুবাদ ও রূপান্তরের চাইতে বড় ও মৌলিক কোন কাজ আসিরীয়রা অবশ্য করে উঠতে পারে নি। আসিরীয় নৃপতিদের দ্বারা স্থাপিত সুবিশাল গ্রন্থাগারগুলি সেই কাজের প্রমাণ। সুমেরীয় বিজ্ঞান, সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞান, আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞান—মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় এই ছিল বিজ্ঞানের কালগত বিন্যাস।

মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলনিয়ায় সভ্যতার আদিকাল থেকেই যাদু, আধ্যাত্মিকতা ও ভবিষ্যৎ-বিদ্যার বিশেষ প্রাধান্য ছিল, যদিও কোষ্ঠী রচনা ও কোষ্ঠী বিচার এসেছে অনেক পরে। শৃঙ্খলাবদ্ধ

পর্যবেক্ষণ ও কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যাদুকররা বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পথটি সুগম করেছিল। যাদুক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য তাদের একটি নিজস্ব ভাষারীতি ছিল, মুখের ভাষা থেকে যা নিতান্ত আলাদা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মত অনেকটাই টেকনিকাল। মেসোপটেমিয়ায় ছিল 'তালিকা বিজ্ঞান'ও—বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য বিশেষ্য-নামের অভিধান সদৃশ সংকলন, যে তালিকা তাদের ধ্বনিবিদ্যা ও অনুবাদ উভয়কেই সমৃদ্ধ করেছে। এই শব্দকল্পদ্রুম যতটা ভাষাগত ততখানি বৈজ্ঞানিক হয়ত ছিল না কিন্তু প্রয়াসটির পিছনে বিজ্ঞান মানস লক্ষ্য করার মতন। ব্যাবিলনের লোককথা থেকে এও স্পষ্ট যে মানুষ ও জীবজন্তুর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের তীক্ষ্ণ ধারণা ছিল, সঙ্গের অঙ্কনগুলি তাদের শারীরবিদ্যায় অধিকারও ঘোষণা করে।

সংগঠিত বিজ্ঞান

তাদের গণিত বিষয়ক মৃৎলিপি, গণনা সংক্রান্ত ও সমস্যা সংক্রান্ত, মোটের উপর, এই দুভাগে বিভক্ত। গুণফল, বর্গ ও ঘনফল নির্ণয়ে তারা মিশরীয়দের অতিক্রম করেছিল। ব্যাবিলনের বিজ্ঞানে সংখ্যা ও গণনা অন্যদের মত দশমিক পদ্ধতি ছিল না, স্থান ও মান—দুই ক্ষেত্রেই তা ছিল ষাটের এককের উপর নির্ভরশীল, ফলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জটিল। ভগ্নাংশ এবং ওজন ও পরিমাপ প্রণালীর প্রচলন থাকলেও ৪৯৩ খৃ. পূ. র আগে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় নি। পাটিগণিত ছিল মূলত সহজ গুণন ও ১-এর বিভাজন জনিত ভগ্নাংশ। অন্যান্য বিভাজনের জন্য দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হত, যেমন $\frac{৫}{৭}$ এর মান নির্ণয়ে $\frac{১}{৭}$ এর মান নির্ধারণ করে তাকে ৫ দিয়ে গুণ করা, ইত্যাদি। মৃৎলিপিগুলি থেকে ২-এর বর্গমূলের বেশ বিশুদ্ধ মান, বিশুদ্ধ ঘন সংখ্যার ঘনমূল, সহজ সমান্তর ও গুণান্তর শ্রেণী, এবং সরল লগারিদমের উল্লেখও পাওয়া গেছে। অবশ্য সর্বত্রই সমাধানের

উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে, কোন পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের কথা নেই, যে জন্য মনে হয় সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে করে উত্তরগুলি পাওয়া যা গণিতে তাদের দৈন্যই নির্দেশ করে। বীজগণিতের ক্ষেত্রে যেমন প্রতীকী পদ্ধতির বদলে সংখ্যা ও পাটিগাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করে তারা এক-ঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করেছে। যথারীতি গণনা ও সমাধানের উত্তর দেওয়া আছে, সূত্র বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উল্লেখ নেই। যে এক-ঘাত সমীকরণে একাধিক রাশি অজ্ঞাত, তারও সমাধান করা হয়েছে ওইভাবে, দ্বিঘাত সমীকরণে ঋণাত্মক রাশিকে যেমন রাখা হয়েছে আলোচনার বাইরে।

প্রবণতার দিক দিয়ে গ্রীকরা যদি ছিল জ্যামিতি নির্ভর তো মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের বলা যাবে সংখ্যাপ্রেমী। সমস্ত গাণিতিক সম্পর্ককে তারা সীমায়িত করে নিয়েছে সংখ্যার প্রয়োগে, এমনকি, জ্যামিতি ও জ্যোতিষকেও। প্রাথমিক জ্যামিতিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—গঠনগত ধারণা ও বিশ্লেষণমূলক ধারণা। ব্যাবিলনের জ্যামিতি পুরোপুরিই বিশ্লেষণমূলক। সরলরেখা, ত্রিভুজ বা বৃত্তের জ্যামিতিক ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। বীজগণিত ও পাটিগণিতের মাধ্যমে তারা জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করেছে। ক, খ ও গ—তিনটি সংখ্যা যদি এমন হয় যে, ক-এর বর্গ +খ-এর বর্গ=গ-এর বর্গ, তাহলে এই তিন সংখ্যাকে একত্রে বলা হয় পাইথাগোরাস শ্রেণীর সংখ্যা। সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এই রকম সংখ্যার একটি ছোট তালিকাও এরা তৈরি করেছিল, এর পেছনের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটি অবশ্য অনুমানও করতে পারে নি। এদের কাছে বৃত্ত ছিল মূলত আলংকারিক গঠন, π এর মান সাধারণভাবে ৩ বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা মিশরীয়দের মানের তুলনায় অশুদ্ধ, ক্ষেত্রফল ও আয়তন বিষয়ক জ্যামিতিতেও এরা মিশরীয়দের চেয়ে পেছিয়ে ছিল।

জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র

মেসোপটেমীয়দের সুনাম ছিল জ্যোতিষে। ২০০০ খৃ. পূ. থেকে তাদের এই বিদ্যার চর্চা। খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ তারা সূর্য ও চন্দ্রের পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয়ে ও গ্রহণের দিনক্ষণ আগে থেকেই বলে দিতে সক্ষম হয়। রাজা অসুরবানীপালের গ্রন্থাগার থেকে আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে চন্দ্রপৃষ্ঠকে ২৪০টি সমান ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার পনেরো দিনে চাঁদের ওই ২৪০ ভাগ ক্রমান্বয়ে ও ধারাবাহিকভাবে উজ্জ্বল হতে থাকে এবং গণনা করে দেখানো হয়েছে প্রথম পাঁচ দিনে এই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় গুণান্তর শ্রেণীতে ও শেষ দশ দিনে সমান্তর শ্রেণীতে। সুমেরীয় বর্ষপঞ্জীতে ২৯½ দিনে একমাস ও বারো মাসে এক বছর গণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক বছরে ৩৬৫¼ দিনের পরিবর্তে ৩৫৪ দিন, ফলে প্রয়োজন অনুসারে কোন বছরে অতিরিক্ত একমাস সংযুক্ত করা হত। তারা ২৪ ঘণ্টায় এক দিন ও সাত দিনে এক সপ্তাহের প্রচলনও করেছিল, পরে দিনকে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডেও তারা বিভক্ত করে যা খাস ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীর আগে করা হয় নি। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাবিলনের বিজ্ঞানীরা কিছু যন্ত্রপাতিও তৈরি করেছিল, সৌর ঘড়ি সম্ভবত তাদেরই আবিষ্কার। অবশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তারা একটি সুবিশাল আয়তাকার ঘর রূপে কল্পনা করেছে, পৃথিবী যার মেঝে। শুরুতে যে ভবিষ্যৎবাণী ও কোষ্ঠীবিচারের কথা উল্লেখ করেছিলাম মেসোপটেমীয় জ্যোতিষে তা ছিল প্রধানত দেশ, জাতি ও গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে, গ্রীকদের হাতে গিয়ে এই সম্মিলিত-ভাগ্যগণনা ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য-গণনায় রূপান্তরিত হয়। ব্যাবিলনের জ্যোতিষ ছিল তাদের জ্যামিতির মতই বিশ্লেষণাত্মক। বিভিন্ন গ্রহের গতি নির্ধারণে তারা যথেষ্ট উন্নত পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছিল ও তাদের নির্ধারিত গণনা

আধুনিক গণনার খুব কাছাকাছি ও অনেক সময় গ্রীকদের গণনার চাইতে বিশুদ্ধ।

মেসোপটেমিয়া থেকে পাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক মৃৎলিপিগুলি সমস্যার সমাধান, প্রসঙ্গের উল্লেখ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত, তত্ত্ব প্রকল্প ও সিদ্ধান্তের পরিমাণ তুলনায় ঢের কম। বিভিন্ন প্রতীতিকে সংখ্যাগত ও মানগত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুমান করা, তাদের ভিতর নানান্ পাটিগাণিতিক সম্পর্ক নির্ধারণ, কিন্তু কখনোই ওই সব তথ্যকে কোন তাত্ত্বিক অনুমিতির রূপ না দেওয়া, দিতে না পারা—এই ছিল ওই বিজ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ।

ব্যাবিলনের চিকিৎসাশাস্ত্র লক্ষণ, নিদান, রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়, এই চারটি শাখায় বিভক্ত। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি প্রধানত অঙ্গক্রম ও দ্বিতীয়ত রোগক্রম অনুসারে আলোচিত। মাথা কান চোখ যুক অন্ত্র পাকাশয় জননাঙ্গ পায়ু ও নিম্নাঙ্গ-এর বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আলোচনা আছে, আছে পাণ্ডুরোগ, স্ত্রীরোগ ও অপুষ্টির কথাও। ভেষজবিদ্যায় একশো পঞ্চাশের বেশি ওষধির উল্লেখ আছে, বলা আছে সঠিক উপায়ে ওষধি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, ওষধির কোন্ অংশ সেব্য (বীজ শিকড় রস অথবা বাকল) ও সেবনের প্রাসঙ্গিক শর্তাদিও (কোন্ সময়ে, কতক্ষণ অন্তর, কোন্ তাপমাত্রায় ও কী কী পথ্যের সঙ্গে সেব্য)। শুধু ওষধিই নয় ভেষজ গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের লবণ ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথাও জানা যায়। শল্যচর্চার তথ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নি কিন্তু এই শাখায় মেসোপটেমিয়দের কম বেশি সাফল্যের বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত। নৈতিক ও পেশাগত ভাবে চিকিৎসকরা ছিলেন দায়িত্ববান ও এই কাজের জন্য তাদের পারিশ্রমিকও দেওয়া হত উঁচু হারে।

ভারতবর্ষ ও হিন্দু বিজ্ঞান ঃ

২৫০০ খৃ. পূ. এর কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের সূচনা যার ইতিহাস বিস্তৃত বিবরণ সহ সু-লিপিবদ্ধ। বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থে ওই আদিকাল থেকেই নানান্ বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের কম বেশি উল্লেখ আছে যার কিছু আকস্মিক, অধিকাংশই সচেতন। আচারগত, অনুষ্ঠানগত পর্যবেক্ষণাদির কল্পসূত্র, ধর্মীয় বেদী নির্মাণের গাণিতিক নিয়মাদির শূল্যসূত্র ইত্যাদি। যেমন স্তোত্র আবৃত্তির বিশেষ পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত ভাষা ও ধ্বনিবিদ্যার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়াস। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে শাখাটি দেশে বিদেশে সবচেয়ে প্রশংসিত হয়েছে তা চিকিৎসাশাস্ত্র, আরোগ্য ও আয়ু সম্পর্কিত বিদ্যা বলে যার অন্য নাম আয়ুর্বেদ। শুরুতে শরীর ও চিকিৎসা বিষয়ক বহু তথ্য বেদের ভিতর ছড়ানো ছিল। আয়ুর্বেদের জন্ম হতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে দুটি মতবাদ এল—একটি মূলত কায়চিকিৎসা সংক্রান্ত আত্রেয় ঘরানা, আত্রেয়, তার শিষ্য অগ্নিবেশ, তার শিষ্য চরক প্রমুখ যে সম্প্রদায়ের আর একটি মূলত শল্যচিকিৎসা সংক্রান্ত ধন্বন্তরি ঘরানা, ধন্বন্তরি, তার শিষ্য সুশ্রুত প্রমুখ যে সম্প্রদায়ের। আদিতে আয়ুর্বেদ শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল, এই শাস্ত্রকে অগ্নিবেশ সবচেয়ে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন যা পরে চরক কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে চরকসংহিতা নামে পরিচিত হয়। চরকসংহিতার আটটি স্থান যথাক্রমে—এক. দ্রব্যগুণ ঃ আলোচ্য বিষয়, দ্রব্যের গুণাগুণ ও রোগের কারণ, দুই. নিদানস্থান ঃ আলোচ্য বিষয়, রোগের লক্ষণ ও পরিচয়, তিন. বিমানস্থান ঃ দেহ ও মনের পরিচয়, চার. শরীরস্থান ঃ মানুষের শরীরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মাংসপেশী, শিরা, হাড়, বহিরাঙ্গ ও অন্তর্ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, পাঁচ. ইন্দ্রিয়স্থান, ছয়. ওষুধ, সাত. চিকিৎসকের প্রতি নির্দেশ, আট. আত্মা ও আয়ু সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা। রোগবিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধ পদ্ধতির—যাতে অসুখকে তিনটি উপায়ে ব্যাখ্যা করা হত, এক. শরীরের কোন্ উপাদান দায়ী, এই

অনুসারে, দুই. আক্রান্ত অঙ্গ ও তার অবস্থা অনুসারে, তিন. রোগের মূল লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে—সঙ্গে রোগবিজ্ঞানের গ্রীক পদ্ধতির বিস্ময়কর সমান্তরায়ন লক্ষ্য করা যায়। আর একটি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাগ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতা শল্যচিকিৎসা নিয়ে। মনে হয় যোদ্ধাদের শরীরে বিদ্ধ শলাকা অপসারণ করতে গিয়েই শল্যচিকিৎসার সূচনা। সুশ্রুতসংহিতায় এই কাজে ব্যবহারযোগ্য একশো অস্ত্র, হাড় ভগ্ন বা স্থানচ্যুত হলে বিশেষ রকমের বন্ধনী সহ মোট চোদ্দ রকমের পট্টবন্ধনী, চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও গলনালীতে অস্ত্রোপচার, পঙ্গু হাত ও পা কর্তন, পেট তলপেট বুক ও মাথায় শল্যাস্ত্র প্রয়োগ এবং কর্তিত ও বিকৃত অঙ্গাদির পুনর্গঠন বিষয়ে অধিরোপণ প্রণালীর বিস্তারিত আলোচনা আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুই শাখাতেই ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মিশর আরব ব্যাবিলন ও গ্রীসেও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সমাদৃত হত। মধ্য এশিয়ায়, আরবী ও ফার্সি ভাষায় চরকসংহিতা, মঙ্গোলীয় ও তিব্বতী ভাষায় অমৃতহৃদয় ও অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদও হয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আরোগ্যশালা ছিল, শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকরা সেখান থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারতেন, সমাজে তাদের মর্যাদাও ছিল যথেষ্ট। জীবক নামের জনৈক বৌদ্ধ চিকিৎসক তো প্রায় উপাসক রূপে পূজিত হতেন, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কায়চিকিৎসক, শল্য-চিকিৎসক ও শিশুরোগ চিকিৎসক, তাঁর শিশু চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ বৃদ্ধজীবকতন্ত্র অনুবাদিত হয়েছিল। গ্রন্থরচনার এই অভ্যাস ভারতীয় চিকিৎসকদের ছিল, বহু পরবর্তী কালের রুগবিনিশ্চয়, চিকিৎসাসংগ্রহ প্রভৃতি তার প্রমাণ। চরক ও সুশ্রুতের আদি গ্রন্থ দুটি নিয়ে টীকাও রচিত হয়েছে যুগে যুগে, দৃঢ়বল, বাগভট, চক্রপাণি প্রমুখ এই শ্রেষ্ঠ টীকাকারদের অন্যতম।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা

ভারতে যেদিন থেকে বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই গণনা ও গণিতের প্রচলন ও ব্যবহার দেখা গেছে। সংখ্যার জন্য প্রতীক আবিষ্কৃত হয়েছে ও সেই সব প্রতীকের সাহায্যে অতি বৃহৎ সংখ্যা পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে $১০^{২৩}$ অবধি-র উল্লেখ আছে, গ্রীক গ্রন্থে যখন $১০^{৪}$-এর বড় কোন সংখ্যার কথা নেই। শূন্য (০) আবিষ্কারের দাবি আরব ও ভারত দুই দেশই করে থাকে। শূন্য-র নির্দিষ্ট প্রতীক অঞ্চল থেকে অঞ্চলে পৃথক ছিল, যদিও শূন্য-র কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে নবম শতকের পুরাতাত্ত্বিক কীর্তিতে, তবু ষষ্ঠ শতকেই এর উদ্ভাবন ঘটে গেছে মনে করার পুথিগত কারণ আছে। শূন্যের আবিষ্কার গণিতকে নতুন গতি এনে দিয়েছে। তৎকালীন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না, এবং শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অনেকেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীও। ভারতীয় গণিতের ইতিহাস এই গণিতজ্ঞদের সম্মিলিত ইতিহাস। যেমন আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ)। সম্ভবত তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত ও পৃথিবীর চারপাশে চাঁদকে পরিভ্রমণশীল বলে অনুমান করেছিলেন, যেজন্য সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রায় সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তাঁর আর্যভট্টীয় গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ে, কালক্রিয়া/গণিতপাদ/গীতিকাপাদ/গোলকপাদে, বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়, সমান্তর শ্রেণীর যোগফল, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান, ত্রিকোণোমিতির উল্লেখ, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ব্যাখ্যা, কয়েকটি গ্রহের গতি ও গতিপথ, পৃথিবীর গোলত্বের কথা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তিনি বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত বা π এর মান ৩·১৪২৮ রূপে নির্ণয় করেছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীসদেশ ও আরবে আর্যভট্ট পরিচিত ও আলোচিত হয়েছেন। পৃথিবীর আবর্তন বিষয়ে তাঁর মতবাদ সমসাময়িক ও পরবর্তী বিজ্ঞানীদের কোন সমর্থন পায় নি, এক হাজার

বছর পরে কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পায়। যেমন বরাহমিহির (মৃত্যু আনুমানিক ৫৮৭ খৃ.)। তিনি ছিলেন ফলিত জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ। তৎকালে প্রচলিত জ্যোতিষ বিষয়ক পাঁচটি মতবাদ, সূর্যসিদ্ধান্ত/রোমকসিদ্ধান্ত/পৌলিশসিদ্ধান্ত/পৈতামহসিদ্ধান্ত/বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, নিয়ে আলোচনা করে তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে তিনি সূর্যসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন (এই সিদ্ধান্তেই সবচেয়ে প্রাচীন সাইন-টেবিলের উল্লেখ আছে)। ওই গ্রন্থে গ্রহণ, পঞ্জিকা, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য তথ্য রয়েছে। যেমন ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম আনুমানিক ৫৯৮ খৃ.)। চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত তাঁর ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থে পাটিগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা থাকলেও তিনি আসলে ছিলেন বীজ-গণিতের স্রষ্টা, বীজগণিতের প্রতীকী প্রণালী তাঁর হাতেই সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর বীজগণিত আরবী বীজগণিতকে সমৃদ্ধ করে ও আরবী গ্রন্থগুলি থেকে ইউরোপে আধুনিক বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়। ব্রহ্মগুপ্তের বীজগণিত সর্বাধিক সমাদৃত মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাচীন বিজ্ঞানগ্রন্থের অন্যতম। যেমন শ্রীধরাচার্য (জন্ম ৯৫০ খৃ. পর)। পাটিগণিতকে তিনি বীজগণিত থেকে পৃথক করেন ও সম্ভবত শূন্য বিষয়ে প্রথম বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর ত্রিশতিকা গ্রন্থে এ ছাড়া ভগ্নাংশ, ত্রৈরাশিক, সম্ভুয় সমুত্থান, দ্বিঘাত সমীকরণ, বর্গমূল-ঘনমূল ও পরিমিতি নিয়ে আলোচনা আছে। পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর আগ্রহ ছিল। π এর মান তিনি নির্ধারণ করেন ৩·১৬২.. রূপে। গণিতবিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য আরও পরবর্তীকালের, তাঁর কথা বিজ্ঞানের কালগত ইতিহাস পর্যায়ে আসবে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

খৃষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতক পর্যন্ত যুক্তিবিদ্যার প্রতি ভারতীয়দের রীতিমত আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহের দরুণ ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে মানুষের বাক্য শরীর মন আত্মা—সব কিছুতেই তারা মনোনিবেশ করেছে। যেমন বাক্যের দোষ দূরীকরণের জন্য বৈয়াকরণ মহাভাষ্য, শরীরের দোষ দূরীকরণের জন্য চিকিৎসা গ্রন্থাদি, মনের দোষ দূরীকরণের জন্য পাতঞ্জল দর্শন রচনা। যেমন বিজ্ঞান দর্শন ন্যায়শাস্ত্র একে অপরকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রাচীন ন্যায় ও দর্শনে আত্মতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব উভয়ই আলোচিত হয়েছে। বলা হয় জড়তত্ত্বের আলোচনায় কণাদ নাকি বলেছেন সমস্ত পদার্থই অসংখ্য ও সূক্ষতম কণা দিয়ে গঠিত। নব্যন্যায়ে আবার অধ্যাত্মতত্ত্বের বদলে পদার্থতত্ত্বই বেশি আলোচনা করা হয়েছে, পদার্থের গঠন ও ধর্ম বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য। ধাতুবিদ্যা, সঙ্কর ধাতু ও ধাতু-ভস্ম প্রস্তুতি, লোহা নিষ্কাশন, পাতন ও উর্ধ্বপাতন, বিভিন্ন রাসায়নিক যন্ত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রসায়নেও ভারতের সমৃদ্ধ চর্চা ছিল, যে শাস্ত্রে নাগার্জুনের নাম উল্লেখনীয়। স্থাপত্য শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ মঠ ও বৌদ্ধস্তূপের কথা ভাবলেই যা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতটা উন্নতির জন্য কারিগরি ও যন্ত্রবিদ্যায় কুশলতা অপরিহার্য হতে হয়েছে, আদি সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে যন্ত্রাদি নির্মাণের উপাদান, যন্ত্রনির্মাণ ও যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন নির্মাণ কৌশলের কথা আছে। পূর্ত ও স্থাপত্যবিদ্যায় বরাহমিহিরেরও মৌলিক অবদান ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই কারিগরি চেতনার প্রয়োগ ঘটেছে, প্রসূতি ও শল্য চিকিৎসার রোগীদের অচেতন করার জন্য চেতনানাশক দ্রব্যের ব্যবহারে তার প্রমাণ। প্রাচীন ভারতে এমনকি পশুচিকিৎসা ও উদ্ভিদবিদ্যার চর্চাও হয়েছে যার প্রমাণ হস্তি চিকিৎসার পালকপ্যসংহিতা, অশ্ব চিকিৎসার শালিহোত্রসংহিতা, গো চিকিৎসার গৌতমসংহিতা ও উদ্ভিদতত্ত্বের বৃক্ষায়ুর্বেদ।[৯]

জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে হিব্রু বা আদি ইসরাইলীয়দের যে সভ্যতা ১০০০ খৃ. পূ. র আগে থেকেই গড়ে উঠছিল, ওই সময়ে তার গুরুত্বের বদলে পরবর্তীকালে বিশ্বের ইতিহাসে এর সামগ্রিক প্রভাবের জন্যই তার প্রসিদ্ধি। এই সভ্যতার দু পাশেই ছিল বৃহত্তর সভ্যতা, দক্ষিণে মিশর, উত্তরে সিরিয়া, আসিরিয়া ও ব্যাবিলন। এই সব সভ্যতার উত্থান পতন অনুসারে হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হত। খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে ব্যাবিলন ইসরাইলীয়দের পরাধীন করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, ব্যাবিলনের দাসত্ব ইসরাইলীয়দের ভিতর একতা, আত্ম-সচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনা আনে এবং নিজেদের ইতিহাস ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এনে দেয়। ইসরাইলে ফিরে এসে তারা সাহিত্য ইতিহাস কবিতা সংগীত লোককথা রচনা করে, ধারাবিবরণী আইন জ্ঞানসংহিতা রাষ্ট্রনীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। সব নিয়ে গড়ে ওঠে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা হিব্রু বাইবেল। পৃথিবীর সর্বত্র আদি আর্যদের প্রাধান্যের যুগে শুধুমাত্র ইহুদিরাই তাদের ধর্ম ও রাজনীতি-সচেতনতার জোরে নিজেদের স্বাধীনতা, ঐতিহ্য ও একতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। যে বৈশিষ্ট্যে তারা এমনকি আকৃষ্ট করেছিল বিধ্বস্ত, আর্যদের দ্বারা পরাস্ত নানান্ জাতির অসংখ্য মানুষকেও।

আদি ইসরাইলে যদিও গণনার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, একটি দশমিক, অন্যটি ষাটের এককের উপর নির্ভরশীল, তবু প্রথমটিই মূলত ব্যবহৃত হত। হিব্রু বিজ্ঞান কয়েকটি হাতুড়ে আঙ্কিক পদ্ধতি ছাড়া গণিতের আর কিছুই জানত না। বিশুদ্ধ গণিতের মতন জ্যামিতিও ছিল অবর্ধিত, ও ব্যবহৃত হত কিছু কারিগরী সমস্যার সমাধানে, অবশ্য সুদক্ষভাবেই। মহাজগত বিষয়ে হিব্রু ধারণা ছিল নিতান্ত সাদামাটা, শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণটি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়মানুগ শ্রেণীকরণের দরুণ উল্লেখ্য। বর্ষ গণনা হত চান্দ্রমাসকে

ভিত্তি করে ও যেহেতু বারোটি অনুরূপ মাসে ৩৫৪ দিন হয়, সৌর বৎসরের সঙ্গে তাল রাখার জন্য প্রতি দুই বা তিন বৎসর অন্তর একটি অতিরিক্ত মাস সংযোজিত হত। কয়েক শতক পর প্রতিটি তের সপ্তাহের চারটি ঋতুতে বিভক্ত হয়ে হিব্রু বৎসর ৩৬৪ দিনের রূপ পায়। চিকিৎসাবিদ্যাও ছিল নেহাত আদিম, রোগ সারাবার কোন কোন পদ্ধতি অবশ্য যথেষ্ট যুক্তিসংগত ছিল বলা যায়, পরে স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসাশাস্ত্র হিব্রুজাতি অনেকটাই মিশরীয়দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেয়। মোটের ওপর, তাদের বিজ্ঞান তেমন উন্নত ও অগ্রসর ছিল না।

যা বলেছি, তাদের কৃতিত্ব ছিল ধর্মীয় ভাবনার নতুনত্বে। সেই ভাবনা এই যে তাদের ঈশ্বর অদৃশ্য, সমস্ত পৃথিবীর ঊর্দ্ধে অবাঙমানস-গোচর, অন্যান্য সভ্যতার জাতীয় দেবতাদের মত পৌত্তলিক ও মন্দির নিবাসী নন, ফলে মূর্তি ও মন্দির বিধ্বস্ত হলেও এই ঈশ্বরের বিনাশ হয় না। এই অবিনশ্বরতার ভাবনা তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য ও সর্বজনীন নিয়তিতে বিশ্বাস এনে দিয়েছিল। তাদের সাফল্য এখানেই। ইহুদিরা বাইবেলকে রূপ দিয়েছে না বলে তাই বলা ভালো বাইবেলই গড়ে তুলেছে ইহুদিদের। তাদের মানসিক রূপান্তরের এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন হিব্রু প্রচারকরা, যিশাইয় যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভাববাদী প্রচারকরা ছিলেন প্রধানত রাজনীতিজ্ঞ, ও সমাজ-সংস্কারক, যারা একটি নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন, একটি নতুন শক্তির, তা হল নৈতিক আবেগ, মানবিক বিবেক ও আবেদন। কালক্রমে এই চেতনা পৃথিবীর একটি বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণে আনবে। সে অবশ্য পরের কথা।

মহাচীন ঃ

চীনের প্রাচীন ও প্রথম কৃষি সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল হোয়াংহো ও ইয়াং সি কিয়াং নদীর উপত্যকায় আর্দ্র আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মৌসুমী বনাঞ্চলে। রাজা ও পুরোহিত, কৃষি ও পশুপালন, জীবন ছিল মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার জীবনধারার মতই। ১৭৫০ খৃ. পূ.

নাগাদ চীনদেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য ও নগররাষ্ট্রে বিভক্ত এক সুবিশাল ভূমি। ক্রমে নানান্ যাযাবর উপজাতি, হূন মঙ্গোল তুর্ক তাতার এল, গেল; আক্রমণ, মিশ্রণ, রাজ্যজয়, রাষ্ট্র বিভাজনের মধ্য দিয়ে খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে চীনে কার্যত স্বাধীন পাঁচ থেকে ছয় হাজার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠল। তার ৮০০ বছর আগেই সেখানে ছবির সাহায্যে লেখার পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে, নির্মিত হয়েছে চমৎকার কারুকাজ করা ব্রোঞ্জের ফুলদানি। খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে এসে চীন পেল তার দুই প্রভাবশালী চিন্তাবিদ কনফুশিয়াস ও লাও ৎস-কে। তাদের চিন্তাধারা চীনকে প্রভাবিত করল, সমৃদ্ধির সময়ে কনফুশিয়াসবাদ আর বিপদ ও দুর্ভিক্ষের সময় টাওবাদ, এইভাবে চলল শতকের পর শতক।

গণিত, জ্যোতিষ

শুরুতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, তারপর ভগ্নাংশ, বর্গমূল। জ্যামিতিতে বিন্দু, রেখার সংজ্ঞা, ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়। ক্রমে খৃষ্টীয় ২য় শতকের শেষাশেষি চৌ কুং পাইথাগোরীয় উপপাদ্যের মৌলিক প্রমাণ দিলেন, ১ম শতকের প্রথম পাদে লিউ শিন π এর মান নির্ধারণ করলেন ৩·১৫৪৭। গণিত শিল্প বিষয়ে নয়টি পরিচ্ছেদ-গ্রন্থ থেকে ওই সময়ের গণিতের এইসব চর্চার কথা জানা যায়—১. আয়তক্ষেত্র, ট্রাপিজিয়ম, ত্রিভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা ২. অনুপাত ও শতকরা হিশাব ৩. আন্তর-শ্রেণী ৪. বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের বাহু ও ক্ষেত্রফলের পারস্পরিক সম্পর্ক, ঘনমূল ৫. পরিমিতি, কয়েকটি ঘন বস্তুর আয়তন নির্ণয় ৬. সময় ও সুদের হিশাব ৭·$ax=b$, এই প্রকার সমীকরণের সমাধানে x এর নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কিছু বেশি ও কিছু কম দুইটি মানের সাহায্যে নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা ৮. একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান। সংগীতের গাণিতিক দিক নিয়েও এই সময়ে চর্চা হয়েছে। লিউ হুই ও শুন সু তখনকার চীনের দুই গণিত প্রবর্তক। পরবর্তীকালে গণিতশিল্প-বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থটির এক টীকায় বিভিন্ন

গণনাযন্ত্রের এবং সমান্তর ও গুণান্তর শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬২৫ খৃ.-এ ব্যবহারিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করা গেল। ৫ম শতকে শূ চুং-চি π এর মান নির্ণয় করলেন ৩.১৪১৫৯২ রূপে। ৭ম/৮ম শতকে ভারত থেকে প্রাপ্ত শূন্য (০) চিহ্ন ৯ম শতক থেকে গণিতে বহু-প্রযুক্ত হতে শুরু করল।

জ্যোতিষে ১৩৬১ খৃ. পূ.-এর চন্দ্রগ্রহণ ও ১২১৬ খৃ. পূ.-এর সূর্য-গ্রহণের কথা আছে। খুব প্রাচীন তথ্যেও ৩৬৫¼ দিনে বৎসর পূর্ণ হওয়ার কথা পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রহের এবং সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন ও অবস্থানের বিষয়ে চীনাদের প্রশংসনীয় তথ্য জানা ছিল। তারা অয়নবিন্দু ও বিষুবীয়বিন্দুর বর্ণনা দিয়েছে, ও বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করে ১৪৬৪টি তারকার তালিকা রেখে গেছে। জলকল ও ভূমিকম্পলিকের উল্লেখও খৃ. ২য় শতকের জ্যোতিষে পাওয়া যায়। পরে এই সব জ্যোতিষ-যন্ত্রের আরও উন্নতি হয়, ৭২৫ খৃ.-এ ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রচক্র আবিষ্কৃত হতে যান্ত্রিক ঘড়ির উদ্ভাবনের পথও উন্মুক্ত হল।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

মহাচীনের চিকিৎসাবিদ্যা ভারতীয় আয়ুর্বেদের ছায়ায় বেড়ে উঠেছিল। চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল মূলত ভেষজবিজ্ঞান। সহজ শল্যচিকিৎসার ও চেতনা নাশক পদার্থ হিশেবে বিশেষ এক মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের কথা জানা গেছে। কনফুশিয়াসবাদ শব ব্যবচ্ছেদের বিরোধিতা করায় শল্যবিদ্যার চর্চা পরে থেমে যায়। উদ্বন্ধন ও বিষ-ক্রিয়ার মত আকস্মিক দুর্ঘটনায় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ও পাকস্থলী বিধৌত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নাড়ীপাঠ ও সূঁচের সাহায্যে করা আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি কালক্রমে চীনা চিকিৎসকদের প্রধান দুই অবলম্বন হয়ে ওঠে। ভেষজ কর্মে ব্যবহারের জন্য তখন ৩০০টি গাছগাছড়া ও ৩৬টি খনিজ পদার্থকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ৬১০

খৃ.-এর চিকিৎসাবিদ্যায় প্রথম হাম আমাশা প্লেগ ও variola রোগের বিস্তারিত বিবরণ এবং কুষ্ঠ কলেরা ও রিকেট রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে ৬৭টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ১৭২০ প্রকার রোগের একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ৬৫২ খৃ.-এ স্ত্রী ও শিশু রোগ নিয়ে আলোচনাও গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে ৭১৭ রকম ওষুধের ব্যবহার এবং ম্যালেরিয়া বেরিবেরি œdema ও nyctalopia-র মত বিশেষ রোগের জন্য বিশেষ ওষুধের প্রচলন ছিল।

পদার্থবিদ্যায় তখন গতি, ওজন, অবতল দর্পণ ও উৎক্রান্ত প্রতিবিম্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শাউ ইয়েন হলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন যে পাঁচটি উপাদান হল মাটি আগুন ধাতু জল ও কাঠ। ২২০ থেকে ২৮০ খৃ.-এর মধ্যে চীনদেশে চক্রবাহী যানের আবিষ্কার হয় ও কাগজের ব্যবহারের বহুল প্রচলন দেখা যায়। তার দুশো বছরের মধ্যে চীন হয়ে ওঠে কারিগরী সাফল্যে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর জাতি। রকেটের ব্যবহারও এই দেশ থেকেই পাশ্চাত্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চীনের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এই কারিগরী উন্নতির সঙ্গে কোনদিনই তাল রেখে চলতে পারে নি।

বুদ্ধবাদ ও বিজ্ঞান

খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের পাশাপাশি সময়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে তিন মহামানব, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ, ইহুদিদের মধ্যে ভাববাদী প্রচারক যিশাইয় ও গ্রীসে পদার্থের প্রকৃতি বিষয়ে গবেষক হেরাক্লিটাস, একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে মানব সভ্যতায় নিজেদের যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছিলেন। বুদ্ধের শিক্ষা ছিল সূক্ষ্ম, মননসম্পন্ন, আধিবিদ্যক, প্রচলিত আর সমস্ত পুরাণমুখী, অতীন্দ্রিয়, মরমীয় ও ভক্তি / বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ধর্মচিন্তা থেকে একেবারেই আলাদা। সাংসারিক জীবনে, উত্তরণের

জন্য যে আটটি ধাপের কথা তিনি বলেছেন তা, সৎ, সরল ও নিরহঙ্কার জীবনযাত্রা, সঠিক চরিত্র, বাক্য, উদ্দেশ্য ও আচরণ এবং মানসিক ঋজুতার প্রতি বিশেষ জোর দেয়। বুদ্ধের সমসাময়িক কনফুশিয়াস জ্ঞানের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের উপর বিশেষ জোর দিলেও তাঁর চিন্তার অনেকটাই ছিল রাজনৈতিক—সরকারের দয়িত্বশীল ও বৈজ্ঞানিক শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তির সক্রিয় জীবন প্রণালী সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র ধারণা ছিল তাঁর যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন শাসকের উপদেষ্টা হতে চেয়েছিলেন, এ দিক দিয়ে তাঁকে প্লেটোর সদৃশ বলা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর চীনদেশের সংগঠনে সঠিক ও মহৎ ব্যক্তিজীবন যাপন বিষয়ে তাঁর এই গণমুখী, প্রত্যক্ষ ও অনাড়ম্বর শিক্ষার আমূল প্রভাব পড়ে। তুলনায় টাওবাদ ছিল অস্পষ্ট, রহস্যময়, কল্পনাপ্রবণ ও অতীতমুখী। যদিও অলৌকিক ধারণার প্রশ্রয় ছিল না তবু জাতীয় মানের সার্বিক উন্নতির চাইতে টাওবাদ ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়নের কথা বেশি ভেবেছে। এমনিতেই চীনের ভৌগলিক সংসক্তি, অন্যান্য সভ্যতা থেকে দুর্গম দূরত্ব এবং নৌ ও বাণিজ্যের পরিবর্তে কৃষির উপর নির্ভরতা অবরোহী বিজ্ঞানের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তার ওপর টাওবাদ ও কনফুশিয়াসবাদ দুইই, কার্যাদির কারণ ও ফলাফল একে অন্যের পরিপূরক বলে মনে করায়, কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনকে স্বীকার করত না। ফলে জ্যামিতির বদলে বীজগণিত, যন্ত্রবিদ্যার বদলে চৌম্বকশক্তি, শল্যচিকিৎসার বদলে আকুপাংচার—বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে এইভাবে। উৎপত্তির পর বুদ্ধবাদ ভারত থেকে অন্যত্র এবং চীনেও ছড়িয়ে পড়ে। মননসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এই মতবাদ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর কয়েক যুগের মধ্যেই নানান্ সংস্কার ও বিকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে চীনের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে বুদ্ধবাদও দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা দিতে পারে নি। সব মিলিয়ে দেশের সামাজিক অবস্থাই চীনদেশের বিজ্ঞানকে ব্যাহত করেছে।

লৌহযুগের আগমনে অর্থনীতির ধরন গেল পাল্টে। ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবস্থা, কুটিরশিল্পের ও শিল্পসামগ্রীর প্রসার এবং বৈদেশিক বাণিজ্য—অর্থনীতির এই ছিল তিনটি প্রধান উপাদান। লৌহযুগের আগমনের ফলে নতুন যে অবস্থার উদ্ভব হল তাকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছিল গ্রীকরা। প্রাচীন সভ্যতাগুলি থেকে জ্ঞান আহরণ করে তাকে আরও যুক্তিসিদ্ধ, সমৃদ্ধ, বিমূর্ত, তবু সহজবোধ্য করে তোলার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিল গ্রীকরাই। এই পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের কাজ চলেছিল খৃ. পূ. ১২ শতক থেকে খৃ. পূ. ৬ শতক পর্যন্ত। ওই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে গড়ে ওঠা গ্রীক বিজ্ঞান ছিল ধ্রুপদী বিজ্ঞান, চরিত্রে যা সংশ্লেষণধর্মী ও রাজনৈতিক ভাবে যা গণতান্ত্রিক। এই বিজ্ঞান যুক্তি ও বাস্তবতা দিয়ে চিহ্নিত। এ কথা তাদের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শিল্পের বাস্তবতার পাশাপাশি সাহিত্য ও দর্শনের যুক্তি আর স্থাপত্যে সৌন্দর্য ও পরিমিতিবোধ। দর্শন আবার শুধু যুক্তি-গ্রাহ্যই নয়, দ্বন্দ্বমূলকও।

ব্যবহারিক কলাকৌশল থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন থেকে গ্রীক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই নির্ভর করেছে প্রমাণ ও অবরোহী পদ্ধতির ওপর। পরে গ্রীক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাথে মিশরীয় বা সিরীয় ব্যবহারিক কলাকৌশলের মিলনে উল্লেখযোগ্য বহু আবিষ্কার ঘটলেও, গ্রীসদেশে দাসপ্রথার প্রচলনের ফলে কায়িক শ্রমকে দাসসুলভ মনে করার প্রবণতায় হাতের কাজকে মাথার কাজের চেয়ে হীন কল্পনা করে কলা-কৌশলের উন্নতির পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটেছে। দাস প্রথা গ্রীক নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার বিশেষ অবনয়নের জন্যও দায়ী, বস্তুত প্রাচীন সভ্যতাগুলির তুলনায় গ্রীক সভ্যতায় নারীদের অবস্থা ছিল ঢের খারাপ। গ্রীক বিজ্ঞানকে এইবার আমরা সময়-গতভাবে চারটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করে নেব—

১. আয়নীয় (Ionian), খৃ. পূ. ৬ শতক থেকে ঃ Thales,

Pythagoras ও অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানী / দার্শনিকের যুগ। যথেষ্ট বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে এঁরা পৃথিবীর সৃষ্টি, গঠন ও উপাদান বিষয়ে তাঁদের অনুমানের কথা বলেছেন। দার্শনিক বিচারে যে অনুমান ছিল আশাবাদী ও সদর্থক।

২. এথেনীয় (Athenian), ৪৮০-৩৩০ খ্. পূ. ঃ সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিস্টটলের কাল। এঁরা জোর দিয়েছিলেন মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক কর্তব্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের ওপর।

৩. হেলেনীয় (Hellenistic), ৩৩০-২০০ খ্. পূ. ঃ আলেকজাণ্ডারের রাজত্বে ইউক্লিড, আর্কেমিদিস ও অন্য বিজ্ঞানীরা এই প্রথম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের (গণিত, যন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান) একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্তি গড়ে তুললেন।

৪. রোমক (Roman), খ্. পূ. ২য় শতক থেকে ঃ ধ্রুপদী বিজ্ঞান ও পরবর্তী বিজ্ঞানের ভিতর সংযোগস্থাপনকারী সান্ধ্যকাল।

প্রাক লৌহ যুগে গ্রীক সভ্যতা যখন সবে গড়ে উঠছে, গ্রীক দর্শন সেই সময়ে এক সৃষ্টিশীল সামাজিক শক্তির ভূমিকা নিয়েছিল। সমস্ত রকম আধিবিদ্যক ও অলৌকিক ধারণাকে Thales বর্জন করেন; হেরাক্লিটাস প্রবর্তিত অনুমানগুলি ছিল গঠনমূলক, দর্শনশাস্ত্রে বিপ্রতীপের ধারণা তিনিই প্রথম প্রয়োগ করেন—দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তু বা সত্তা পরস্পরের পরিপূরকও বটে ও তাদের সম্মেলন বা সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই উদ্ভূত হয় চূড়ান্ত অভিঘাতও—যেমন ধনুক ও ধনুকের জ্যা, দ্বন্দ্বমূলক দর্শনচিন্তার এটিই ছিল প্রথম উপাদান; পাইথাগোরাসের দর্শন যেমন পুনর্সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের বিচারে আয়নীয় মতবাদ বর্ণনামূলক, গুণাত্মক ও সামান্য অস্পষ্ট বলে মনে হয়। সংখ্যার চর্চা এবং প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে সংখ্যা ও চলরাশির প্রয়োগও অবশ্য এই সময়েই পাইথাগোরাসের হাত দিয়ে শুরু হয়েছে। গাণিতিক ও অতীন্দ্রিয়, চিন্তার এই দুই ধারা তাঁর মতবাদে একত্র হয়। সংখ্যাকে তিনি একদিকে জ্যামিতি ও অন্যদিকে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৃত্ত ও বলয়ের প্রয়োজন তিনিই প্রথম অনুভব

করেছিলেন। তাঁর ঘরানার বিজ্ঞানীদের হাতে এর চর্চা পরে আরও বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের চর্চা ও চিন্তা থেকে পরবর্তী কালের এই দুটি বিষয় গড়ে ওঠে—এক. প্লেটোর আদর্শবাদের ভিত্তিভূমি, দুই. Leucippus ও Democritus-এর অণু-চিন্তা, আধুনিক বিজ্ঞানের উপর যার প্রভাব সীমাহীন; যদিও তাঁদের অণু / পরমাণু সম্পর্কে চিন্তা যথেষ্ট তাত্ত্বিক হয়ে ওঠেনি তবু এই অনুমান আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ৫৬০ খৃ. পূ. নাগাদ Anaximander-এর জীব জগতের ক্রমবিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্তও খুবই প্রশংসনীয়। সক্রেটিসের আবির্ভাবের পূর্বে এই সময়ের গ্রীস দেশে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বস্তুবাদিতা ও মানবতা-বাদী নৈতিকতার প্রাধান্য। এক অখণ্ডতার প্রতীক হিশেবে তখন কল্পনা করা হত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে, যার সুষম ও বিন্যস্ত উপাদানগুলি একে অপরকে সমর্থন ও সহায়তা করে যায়। প্রকৃতির এই অখণ্ড বৃত্তে মানব জীবনও অন্তর্ভুক্ত। Lucretius যে অনুভব ও মানসিকতাকে অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন।

এথেনীয় বিজ্ঞান আয়নীয়দের দার্শনিক অনুমান ও হেলেনীয়দের সুসম্বদ্ধ গণনার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেছে। অমূলদ রাশি আবিষ্কারের পর থেকে গ্রীক গণিতজ্ঞরা সংখ্যার পরিবর্তে রেখার ও আকারের চর্চায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন যার ফলে পরিমাপমূলক জ্যামিতির বিকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে Hippocrates, যাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইউক্লিডকে তাঁর জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য রচনায় প্রভূত সাহায্য করে ও Eudoxus-এর যিনি অনুপাত বিষয়ক তত্ত্ব ও বলয়-মিতি এবং কলন সম্পর্কে আদিতম উল্লেখের জন্য প্রসিদ্ধ, নাম উল্লেখযোগ্য। Eudoxus শংকু ও পিরামিডের আয়তন সংক্রান্ত কয়েকটি উপপাদ্যও রচনা করেছিলেন। তবু এথেনীয় যুগ মূলত সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিস্টটলের নামে পরিচিত। দর্শনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় দার্শনিকরা এই পর্যন্ত পৃথিবী ও প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছেন, যদিও মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রকৃতি ও পৃথিবীকে পাল্টানো। এই দিকে সক্রেটিসের কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা দেখা দরকার। তাঁর ধারণা এই যে মানুষের চূড়ান্ত

সিদ্ধি জ্ঞানে, এর মাধ্যমেই ব্যক্তিমানুষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ তাঁর দর্শনচিন্তার দুটি দিক, একটি বস্তুগত, অন্যটি নীতিগত। তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু দর্শনের বস্তুগত দিকটিকে গৌণ করে তোলে ও পরের দু হাজার বছর ধরে দর্শন বস্তুত নীতিবিদ্যায় পর্যবসিত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী প্লেটো দার্শনিক হিশেবে ছিলেন আদর্শবাদী, দি রিপাবলিক এবং দি ল'জ গ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার যে পরিচয় আছে তা থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রের এমন এক সংবিধানের তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যা অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত সনাতনী সুযোগ সুবিধার সমর্থক হবে। অর্থাৎ জন-গণতান্ত্রিক বিচারে প্লেটো পৃথিবীকে পাল্টানোর প্রয়াসের বিরোধিতাই করেছেন। কাজের মাধ্যমে কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণে আনার চাইতে শব্দ দিয়ে জনগণকে প্রভাবিত করার পদ্ধতিই তাঁর কাছে বেশি মননশীল মনে হয়েছে। মননের চর্চার জন্য তিনি যে আকাদেমি স্থাপনা করেছিলেন তা আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের আদিসূরী। প্লেটোর সত্য, সুন্দর ও শুভ-য় অতিরিক্ত বিশ্বাস বহুদিন ধরে সক্রিয় পদার্থবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতের চর্চাকে ব্যাহত করতে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান পদার্থ, জীব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গত বিভিন্ন তত্ত্বের উপস্থাপনায়। যদিও মহাজাগতিক সিদ্ধান্তের উল্লেখে তিনি ছিলেন আশ্চর্যভাবে নীরব। তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক হলেও তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলা বেশি হবে। তুলনায় আরিস্টটল যতটা না দার্শনিক তার চেয়ে বেশি যুক্তিবাদী। তাঁর অবদান বহুমুখী, যেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিপজ্জনকটি হল তাঁর শ্রেণীবিভাজনের প্রয়াস। তাঁকে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যাবিশারদ বলা যায়, জীব-বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁর পর্যবেক্ষণ ও রচনা মান ও পরিমাণ উভয় বিচারেই বিস্ময়কর। আরিস্টটল প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রটি আমাদের প্রথম সংগঠিত গবেষণাগার। বৈজ্ঞানিক হিশেবে তিনি সবসময়েই ইন্দ্রিয় স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বাস্তবতার পক্ষপাতী।[১০]

দার্শনিক মতবাদ প্রথম পর্যায়ে যা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে সাহায্য

করেছে, দ্বিতীয় পর্বে যা রাজনৈতিক ঘটনাধারা থেকে নিজেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে, হেলেনীয় সময়ে এসে দেখা গেল তা মূলত নৈতিকতার চর্চা। বিজ্ঞানের জগতও এই সময় থেকে হয়ে পড়ল অল্প সংখ্যক কিছু বিশেষজ্ঞের জগত যাঁরা সেই সমস্ত জটিল সূক্ষ্ম ও উন্নত মতামত ও অগ্রগতির কারণ যথেষ্ট শিক্ষিত সাধারণ নাগরিকদেরও যা ধারণার আয়ত্তের বাইরে। বৈজ্ঞানিক সমস্ত প্রচেষ্টা তখন প্রতিপত্তি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে রাষ্ট্রনির্ভর। তাই রাষ্ট্রের এই কাঠামো যেদিন ভেঙ্গে গেল বিজ্ঞানের জগতটিও তখন চরম আঘাত পেল এবং যেহেতু নগরের বাইরের বৃহৎ সমাজে ও বিজ্ঞানী ছাড়া অন্যদের ভিতরে এই জগতের শিকড় ছড়িয়ে যায় নি তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখাই হয়ে উঠল দুঃসাধ্য। সে অবশ্য পরের কথা। হেলেনীয় পর্যায়ের সুদক্ষ বিজ্ঞানীদের মধ্যে Strato, শঙ্কু আকৃতির পাত নিয়ে গবেষণার জন্য Menaechmos প্রসিদ্ধ। জ্যোতির্বিদ্যায়, Hipparchus হলেন আমাদের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষক। তারকা ও নক্ষত্রের শ্রেণীবদ্ধ তালিকার এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সূচকের তিনি প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তী দু হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত অধিকাংশ জ্যোতির্যন্ত্রের তিনিই আবিষ্কর্তা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও গণনায় Ptolemy-র অনেক অনুমান রীতিমত নিখুঁত। যন্ত্র ও যন্ত্রগণকেও তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায়। সৌরমণ্ডলের (অবস্থান ও আবর্তন) পদ্ধতি সম্পর্কে Aristarchus-এর মতবাদ বহু পরে কোপারনিকাস কর্তৃক পুনরুল্লিখিত এবং গ্যালিলিও কেপলার নিউটন কর্তৃক প্রমাণিত হয়। জ্যোতিষে ক্রমিক অগ্রগতির দরুন সেই প্রথম বিজ্ঞান সম্মত ভূগোল সম্ভব হয়ে ওঠে। পৃথিবীর পরিধি ২৪,৭০০ মাইল হিসেবে গণনা করা হয়, প্রকৃত দৈর্ঘের সঙ্গে এর মাত্র ২৫০ মাইলের তফাত।

অমূলদ রাশির আবিষ্কার গ্রীক গণিতকে যে সংকটে ফেলেছিল তা থেকে উদ্ধার পেতে পাটিগণিত জ্যামিতির দিকে ঝুঁকে পড়ল আর ইউক্লিডের গণিতেরও অনেকটাকেই বলা যেতে পারে জ্যামিতিক বীজগণিত। যে বক্তব্য বা বর্ণনা এমনই সত্য ও গ্রহণযোগ্য যে

প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না তাকে বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ, অনুরূপ কিছু স্বতঃসিদ্ধের সাহায্য নিয়ে ইউক্লিড জ্যামিতির এমন এক সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত প্রণালী গড়ে তোলেন যে শত সহস্র বছর পর জনৈক বন্ধু যখন বলেছিলেন ইউক্লিড তাঁর কাছে তেমন মূল্যবান মনে হয় না তখন নিউটন যিনি কদাচিৎ হাসতেন অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন। স্বতঃসিদ্ধ থেকে অবরোহণে প্রাপ্ত জ্যামিতির সাফল্য গ্রীক বীজগণিতের চর্চাকে ব্যাহত করেছে, এই শাখায় প্রকৃত উন্নতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরবীয় গণিতের। সবশেষে আর্কেমিদিস, বৃত্তের ফলিত বর্গ-করণ, বলয় চোঙা ও আরও জটিল আকৃতির ঘনবস্তুর আয়তন ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র এবং অন্যান্য গাণিতিক অবদান ছাড়াও তাঁর হাত দিয়েই যন্ত্রবিদ্যা, স্থিতিবিদ্যা ও জলস্থিতিবিদ্যার সূচনা। তাঁর স্থিতিবিদ্যার উপাদানগুলি যন্ত্রবিদ্যা থেকে আহৃত ও জলস্থিতিবিদ্যা ভাসমান বস্তুর সূত্রসমূহ এবং বায়ুর বিচলনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে। রেনেশাঁসের আবির্ভাবের আগে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় নি।

মোটের উপর চরিত্রে গ্রীক বিজ্ঞান ছিল গণিতপ্রধান ও যন্ত্রবিদ্যক। তা ছাড়া ছিল বিজ্ঞানীদের কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা। সব মিলিয়ে রসায়নে গ্রীকদের অবদান তাই সীমিত। কাঁচ প্রস্তুত ও বিশুদ্ধ ধাতুযৌগ উৎপাদন করা ছাড়া আরও সমৃদ্ধ কোন রাসায়নিক কলা-কৌশলের উদ্ভাবন এদের হাত দিয়ে হয় নি। সামাজিক অবস্থা চিকিৎসকদের পক্ষে ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। অভিজাত শ্রেণীর জীবন প্রণালী ছিল স্বাস্থ্য বিরোধী। ফলে চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতই। গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নাড়ীর গতি, তার কর্মধারা ও শরীরের উপর প্রভাব; ইন্দ্রিয়গত ও চালক স্নায়ু; এবং মস্তিষ্কের শ্রম ও চিন্তা প্রসূত সংকোচন, প্রসারণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত এই রকম সমস্ত চিন্তাভাবনাকে একত্র করে ও তাদের আরও সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করে প্রচারের জন্য গ্রীক চিকিৎসা ও শারীর-বিদ্যায় Galen নিজেই এক ঐতিহ্য।

রোমান বিজ্ঞান

গ্রীক বিজ্ঞানের আলোচনায় হেলেনীয় বিজ্ঞানের কথা এসেছে। হেলেনীয় বিজ্ঞানের পরবর্তী কাল থেকে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যবর্তী সময়ের বিজ্ঞানকে রোমান বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। গ্রীকদের প্রভাবে আসার আগে রোমানরা যাদের অধীনে ছিল তাদের ছিল আদিম বিজ্ঞান। কিন্তু কলাকৌশলের কাজে, সেচ ও জল নিষ্কাশনে, স্থাপত্যে—অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এরা ছিল খুবই সুদক্ষ। রোমানরাও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে নিজেরা তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি, কিন্তু রাস্তা সেতু জাহাজ খাল নির্মাণে, কাঁচ ও ধাতু দ্রব্য তৈরিতে অর্থাৎ প্রযুক্তিগত কাজে তারা উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছে। হেলেনীয় যুগে স্থাপিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, গবেষণাগার, যাদুঘর ও গ্রন্থাগারকেও তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার দায়িত্ব তারা অবশ্য গ্রীকদের উপরই ছেড়ে দেয়। কালগত ভাবে যাঁরা এই সময়ের বিজ্ঞানী, তাঁদের মধ্যে যাঁদের কথা আগে বলিনি, যেমন প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ Apollonios (মূল কাজ শঙ্কু ও জ্যামিতিক ছেদ বিষয়ে), Menelaos (গোলক বিষয়ে), Heron (ধরাকৃতি ও মেট্রিক্স বিষয়ে), গণিতজ্ঞ Diophantos (মূল গ্রন্থ অ্যারিথ্‌মেটিকা), জীববিজ্ঞানী Pliny (মূল গ্রন্থ ন্যাচারাল হিস্ট্রি), চিকিৎসক Herophilos ও Erasistratos (রক্ত সংবহন বিষয়ে) —কেউই রোমান ছিলেন না।

খৃষ্ট প্রভাবিত পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞানের উদ্ভব

খৃষ্টযুগের প্রারম্ভে পশ্চিমী জগতে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নানান্ অযৌক্তিক ভাবনা চিন্তা। ভবিষ্যৎ-গণনা জ্যোতির্বিদ্যাকে, আলকেমি রসায়নকে ও মরমিয়াবাদ দর্শনকে গ্রাস করতে চাইছিল। উদ্ভিদবিদ্যা পর্যবসিত হয়েছিল ওষধি ও দ্রব্যগুণের তালিকা রচনায়,

পশুবিদ্যা বিস্ময়কর প্রাণীর কল্পনায়। চার্চ ও কুসংস্কার বিজ্ঞানকে ঘুম পাড়িয়ে ক্রমেই ঢুকে যাচ্ছিল সেই জড়তায় যাকে পাশ্চাত্যের অন্ধকার যুগ বলে। আর সেই সময়, কয়েক শতাব্দী ধরে, মুষ্টিমেয় কিছু অনুবাদক সম্পাদক ও ভাষ্যকারদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় লিপিবদ্ধ হচ্ছিল বিজ্ঞানের অজস্র বিষয়, যার অধিকাংশই লিপিকারদের পক্ষে ছিল পুরোপুরি দুর্বোধ্য, আর সেই লিপিবদ্ধ জ্ঞান পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহিষ্ণু দেশে। যা না করা হলে, ভবিষ্যতে কোনদিনই হয়ত রেনেশাঁস আসত না।[১১] এর বহু বছর পরে খৃষ্টীয় পাদ্রীদের এক বড় অংশ যখন গ্রীক চিন্তাধারাকে সমর্থনের কাজে এগিয়ে এলেন, নিঃশ্বাসের জন্য বিজ্ঞান আবার বিশুদ্ধ বাতাস পেল। একদা লিপিবদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞান তখন বিজ্ঞানের নব চর্চার উৎস হল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রভাব

গ্রীকদের অবরোহণ নির্ভর বিজ্ঞান কালক্রমে যে দুটি সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী তার প্রথমটি হল—জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রীকরা অবরোহণকেই একমাত্র মননশীল পদ্ধতি বলে ধরে নিতে থাকে আর দ্বিতীয়ত, স্বতঃসিদ্ধকে চূড়ান্ত সত্য রূপে বেছে নেওয়ায় সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান ঐ সব স্বতঃসিদ্ধ থেকেই প্রাপ্ত বা অর্জিত হতে হবে বলে অনুমান করে, যার অর্থ স্বকল্পিত কোন স্বতঃসিদ্ধ পরবর্তীকালে ভুল প্রতিপন্ন হলে তার থেকে অর্জিত সমস্ত অনুমান ও সিদ্ধান্তই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের চর্চায় এই ব্যর্থতার ফল কালগত ও মনস্তত্ত্বগত, দুই দিক থেকেই মারাত্মক। যে জন্য এবং এমনিতে চারিত্রিকভাবেও গ্রীক বিজ্ঞান মূলতঃ বিভিন্ন প্রতীতিকে সমর্থন করার পিছনে সময় দিয়েছে, তাদের ব্যাখ্যা করার কাজে তেমন দেয় নি। আর প্রত্যক্ষ মাপজোখ ক্রমে দর্শনগতভাবে অসঙ্গত মনে করায় তারা পরিমাণগত তথ্য ও রাশিকে প্রায়ই অবহেলা করেছে।

পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সুদীর্ঘকালব্যাপী

অন্ধকার যুগের অবসানে দ্বাদশ শতকের পাশ্চাত্ত্য জগত যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা পুনরারম্ভ করে গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন অবদান, বলা যায়, পুনরাবিষ্কার করতে শুরু করল গ্রীক বিজ্ঞানে অবহেলা ও সীমাবদ্ধতার পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি তখন অবধি ঐতিহ্যে থেকে গেছিল। তা হোক্, পাইথাগোরাসের (খৃ. পূ. ৫৮২-৫০০) গণিত, প্লেটোর (খৃ. পূ. ৪২৭-৩৪৭) অনুমান, আরিস্তটলের (খৃ. পূ. ৩৮৪-৩২২) অভিজ্ঞতা নির্ভর বিদ্যা, ইউক্লিডের (খৃ. পূ. ৩০০ নাগাদ) জ্যামিতি, আর্কেমিদিসের (খৃ. পূ. ২৮৭-২১২) যন্ত্রবিদ্যা, Ptolemy-র (জন্ম ১৩৯ খৃ.) জ্যোতিষ পর্যবেক্ষণ, Galen-র (১৩০-২০১ খৃ.) শারীর ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ইত্যাদি জ্ঞান ও যুক্তির যে ধারা পাশ্চাত্ত্যের হাতে তুলে দিল তা অমূল্য, কেননা তাতে ছিল বিজ্ঞানের অভ্যাস আর বিজ্ঞানের জন্য মানসিক প্রস্তুতি।

গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরাবিষ্কারের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি অবশ্যই ছিল যথেষ্ট জটিল ও প্রায় পাঁচশো বছর ধরে ছড়ানো এক প্রক্রিয়া যার সূচনা খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে আরিস্তটলীয় বিজ্ঞানের সংস্থানের মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে ছিল Galenকে আত্মসাৎ ও আত্মস্থ করার চেষ্টা এবং ভাগ্য-গণনার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষকে চিকিৎসার সঙ্গে সংযুক্ত করা (রোগ নিরাময়ের আধা চিকিৎসা / আধা দৈব পদ্ধতি)। ১৫০০ খৃ. নাগাদ পাশ্চাত্ত্যে আরিস্তটল, Galen ও Ptolemy-র এই সমন্বয় সম্পূর্ণ হল। পুনরাবিষ্কারের কাজটি এক দিকে ছিল আয়তনগতভাবে বিশাল ও খুবই শ্রম সাপেক্ষ, আর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ছিল গ্রীক মানস ও পশ্চিমী ঐতিহ্য—সময়গত ও ভাবগতভাবে পৃথক দুটি ধারাকে একত্র করার সমস্যা। সুবিধে ছিল একটাই, এই কাজে হাত দিয়েছিলেন মধ্যযুগের যেসব পণ্ডিত তাদের প্রায়ই কোন ইতিহাসচেতনা থাকত না, ফলে অতিসরলীকরণে কোন অসুবিধা হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে এসে আজ আমাদের মনে হয় যদি তাঁদের ওই সময়চেতনা থাকত তবে আমরা বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের দিক থেকে হয়ত আরও দ্বন্দ্বমূলক হতাম। আবার, আরিস্তটলের পরিবর্তে প্লেটোর ভাবনা চিন্তা যদি আগে পুনরাবিষ্কৃত হত তবে তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান হয়ত একটু কম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

হয়ে আর একটু বেশি বিমূর্ত বা গণিতপ্রবণ হয়ে উঠতে পারত।

এটা সন্দেহাতীত যে রেনেশাঁস বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক ধারণাটি পেয়েছিল গ্রীক বিজ্ঞান থেকেই। বিজ্ঞানবিপ্লব সম্ভবও হয়েছিল গ্রীক বিজ্ঞানকে পুনরুদ্ধারের ফলেই। কিন্তু রেনেশাঁস-উত্তর বিজ্ঞানের প্রথম কাজই হয়েছে এটা দেখানো যে গ্রীক চিন্তা ও সমাধানের বেশি অংশটাই ভুল। প্রথম দায়িত্বই হয়েছে পৃথিবীর ব্যাখ্যা, পদার্থের ধর্ম, মানুষের শরীর ও গাণিতিক সমস্যা বিষয়ে গ্রীকদের চিন্তা ভাবনাকে সরিয়ে নতুন ও সঠিক চিন্তা ভাবনার প্রতিষ্ঠা করা। যা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান করে উঠতে পেরেছে ১৫০০ খৃ.-র পরবর্তী দুশো বছরেরও কম সময়ে। যে সময়ে শুধুমাত্র Democritus ও আর্কেমিদিসের অবদানই কালজয়ী ও কালোপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। গ্রীক বিজ্ঞান থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে এইভাবে তাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে তাতেই অবশ্য গ্রীক বিজ্ঞানের প্রভাব ও জীবনীশক্তির প্রমাণ।

মায়া সভ্যতা

বহু প্রাচীন কাল থেকে আমেরিকা মহাদেশের বহু স্থানে বহু সভ্যতা ছড়ানো ছিল, আমেরিকায় কলম্বাসের পদার্পণের ঢের আগে থেকেই ছিল। এইসব সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও সুদক্ষ কৃষিবিদ। কফি কোকো তামাক কোকেন ক্যাকটাস, নেশার নানান্ সামগ্রীর তারাই প্রথম আবাদ করে। ওষধির বিচিত্র সংগ্রহ ছিল এদের, তাদের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালের রবার শিল্পের উদ্ভব। কয়েকটি বিশেষ প্রাণীকে এরা সর্বপ্রথম পোষ মানিয়েছে—লামা গিনিপিগ ট্যাকি। এই সব সভ্যতার মধ্যে মায়া সভ্যতা ছিল সবচেয়ে খ্যাতিমান। মায়ারা ছিল বুদ্ধিমান জাত, তারা কোথা থেকে এসেছিল সঠিক করে বলা যায় নি। এরা রেখে গেছিল প্রকাণ্ড এক পঞ্জিকা এবং লিপি ও অঙ্কন সমন্বিত বহু পুস্তক। তারা

রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, অট্টালিকা নির্মাণ করেছে—যে সমস্ত অট্টালিকার অবধারিত প্রতীক হল সাপ, ভাস্কর্য খোদাই করেছে, গড়েছে জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দিরও। তারপর তাদের পাথর দিয়ে গড়া চমৎকার শহরগুলো স্রেফ পরিত্যাগ করে তারা কোথায় ও কেন চলে গেছে সঠিক করে বলা যায় নি, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওগুলো ধ্বংস হয় নি, এ টুকুই বলা যায়। আমেরিকায় যে কোন স্থানীয় সভ্যতার মত মায়াদের অবদানও মূলত ব্যবহারিক। তবে অন্যান্য সভ্যতা যখন জোর দিয়েছে চিকিৎসার ওপর, অঙ্গচ্ছেদ ভ্রূণবিদ্যা ও মস্তকে ছিদ্র করে অস্ত্রোপচারের মত বিষয়ও জানা ছিল, মায়াদের সুনাম সেখানে জ্যোতিষে।

মায়াদের সবচেয়ে পুরনো যে সব প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে তা প্রাচীন সাম্রাজ্যের আমলের—খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৯ম শতক। মায়ারা নাড়াচাড়া করেছে প্রকাণ্ড সমস্ত সংখ্যা নিয়ে, যদিও সময়ের ক্ষুদ্রতম এককের আদ্ধেক, এ ছাড়া ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তারা আর এগোয় নি। মায়া আনুষ্ঠানিক বর্ষ ছিল ৩৬৫ দিনের, প্রতিটি কুড়ি দিনের আঠেরো খানি মাস ও ৫টি অশুভ দিন। কয়েকটি জ্যোতির্বৃত্তের গণনা ও পর্যবেক্ষণে তারা বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। এই গণনা থেকে বলা যায় গড় চান্দ্রমাস মায়ারা নির্ধারণ করেছে ২৯.৫৩০৮৬ দিন হিশেবে, বাস্তবে যা ২৯.৫৩০৫৯ দিন। সূর্যগ্রহণের সম্ভাব্য তারিখের ইঙ্গিতেও তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। মায়া পুরাণে শুক্রের এক বিশেষ স্থান ছিল যে জন্য তাদের নিজস্ব অভ্যাস মত তারা সুদীর্ঘ কাল ধরে (৩৮৪ বছর) ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করে শুক্রের সিনঅডিক আবর্তন সম্পর্কে খুবই বিশুদ্ধ বিচার ও মন্তব্য রাখতে সক্ষম হয়।

বাইজেনটাইন সভ্যতা :

৬ষ্ঠ শতকের গোড়া থেকে ১৫ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুদ্ধ ও আক্রমণের রক্তক্ষয়ী সময়ে বাইজেনটাইন সভ্যতা ধ্রুপদী গ্রীক বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখা আর ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। ৩৩০

খৃ.-র ১১ই মে কনস্তান্তিন-এর হাতে স্থাপিত হয় বাইজেনটিয়া বা কনস্তান্তিনোপল। ৫১৮ থেকে ৫৬৫ খৃ.-র মধ্যে এর শিল্প ও সভ্যতা চূড়ান্ত বিকাশ পেতে শুরু করে। সাফল্যের শীর্ষদেশে তার অবস্থান ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১৪ শতকে। ৭ম শতক এই সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকার শতাব্দী। চতুর্থ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ এবং তারও পরে তুর্কদের আক্রমণ বাইজেনটিয়াকে ধ্বংস করে দিয়ে যায়, পতনের তারিখটি ছিল ১৪৫৩-র ২৯-এ মে। বাইজেনটিয়ায় ছিল সংগঠিত ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা —বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ভিক্ষুকদের আবাসস্থল। ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়মিত প্রসার—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভিতর বাণিজ্যিক লেনদেন হত বাইজেনটিয়ার মধ্য দিয়েই।

বিজ্ঞান

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও সংগীত তত্ত্বের চর্চা হত দর্শন পাঠের মানসিক প্রস্তুতি হিশেবে। শুধু দর্শন নয়, শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল আইনও। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় আর্কেমিদিস, ইউক্লিড ও আরিস্তটলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে রচিত বহু টীকার কথা জানা যায়, J. Philoponos যন্ত্রবিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন করেছিলেন, তাতে গতি বিষয়ে আরিস্তটলের ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং জাড্য বিষয়ে অস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ৬ষ্ঠ শতকের স্থপয়িতারা ব্যবহারিক প্রয়োজনে গণিতকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন, ১০ম শতক থেকে জলচালিত যন্ত্র নির্মাণও শুরু হয়। তখন গ্রীক বিজ্ঞানের আরবী ও পারসীয় অনুবাদও পর্যাপ্ত হয় ও ১৪ শতকে বাইজেনটিয়ার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গণিতজ্ঞ Rhabdas-এর জন্ম হয়। অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানে ইনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রসায়ন, জীব ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনায় বলা যায়, বাইজেনটীয় রসায়ন ছিল মূলত আলকেমিবিদ্যা ও রাসায়নিক কলাকৌশল। যুদ্ধে

ব্যবহারের জন্য 'গ্রীক অগ্নিশিখা' নামে দারুণ দাহ্য একটি তরল পদার্থের তারা আবিষ্কার করেছিল। চিকিৎসার অভিধান ও কৃষি-বিজ্ঞানের গ্রন্থ ছাড়া উদ্ভিদবিদ্যার তেমন উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় নি। তুলনায় অনেক বেশি উল্লেখ্য প্রয়াস হল ডিয়োস্করিডের গ্রন্থগুলিকে ৬ষ্ঠ শতকের শিল্পীদের নিপুণ অলংকরণে অলংকৃত করা। খৃশ্চিয়ান টপোগ্রাফি গ্রন্থে জীবজগতকে বিষয়গত ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা আছে। রেশমগুটি চাষের কিছু কিছু বিষয়ও জানা ছিল। শিকারের অভ্যাস ছিল বলে অঙ্গ সংস্থান এবং শিকারী, শিকারে সাহায্য করে যে সব জন্তু ও যে জন্তুদের শিকার করা হয় তাদের আচরণ ও মনস্তত্ত্বের কথাও তারা জানত। চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল পুরোপুরিই গ্রীক উৎস থেকে আহৃত। দৈব রোগমুক্তির খৃশ্চান বিশ্বাসের প্রভাবও দেখা যেত। আলেকজাণ্ডার ও Aetios-র বইয়ে মস্তিষ্ক কেন্দ্র, স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়বিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিক বইতে ক্যানসার রোগ বিষয়েও মন্তব্য করা হয়েছে। ৯ম শতকের পর থেকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত চিকিৎসাতেও আরবীয় প্রভাব কার্যকরী হয়ে দেখা দেয়।

বাইজেনটিয়ার বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে চার্চের কাছে নিবেদিত ছিল বলে গ্রীক ও হেলেনীয় বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় কোন কাজ তা করে উঠতে পারে নি। বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য ছিল ধর্ম-চালিত সাম্রাজ্য। ধর্মের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কোন মতামত পোষণ করা ও অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করা শুধুমাত্র মননের ব্যর্থতা নয় নৈতিক ত্রুটিরূপে গণ্য করা হত, ফলে সমস্ত স্বাধীন ভাবনাকে ধর্ম দেখত সন্দেহের চোখে। এই সহনকাতরতায় বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হত, সঙ্গে ছিল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ধর্মযুদ্ধ। তবু এই অনিশ্চিত সময়ে সমস্ত পাশ্চাত্ত্যে যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়, বাইজেনটিয়া তখনও একটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তা হল গ্রীক বিজ্ঞানের প্রসারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ অভ্যাসটি। তাই নিজেদের সাম্রাজ্যের পতনের পর বাইজেনটীয় বিজ্ঞানীরা অনেকেই যখন ইটালিতে চলে এলেন তখন তা ইউরোপে রেনেশাঁসের আবির্ভাবে সাহায্য করল বলে বলা হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ইতিহাস ঃ কালগত

প্রাচীন যুগ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির দেশগত পর্যায়ে দূর অতীত থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানের ইতিহাস ও চরিত্র আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখেছি। যে সব দেশে প্রাচীন কালে উদ্ভূত বিজ্ঞান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পরও যথেষ্ট উন্নতিশীল ছিল, যেমন ভারতবর্ষ বা মহাচীন, তাদের বেলায় আলোচনা প্রায় দশম শতক পর্যন্ত টেনেছি। মায়া সভ্যতার মূল বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি ৪র্থ শতক থেকে আর বাইজেনটাইন গ্রীক বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখায় হাত দিয়েছে ৬ষ্ঠ শতক হতে, ফলে এদের ক্ষেত্রে সময়ের দিক দিয়ে অনেকটা অবধি এগোতে হয়েইছে। কালগত ভাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোন বিজ্ঞানকে প্রাচীন যুগে স্থান দেওয়া যায় যদি সেই বিজ্ঞানের ধর্মে প্রাচীনত্ব থাকে, প্রাচীনতা এখানে আদিমতা অর্থে। আরবীয় বিজ্ঞান কিন্তু যেমন কালগত ভাবে ছিল আধুনিক, তেমনি বৈশিষ্ট্য ও মননগত ভাবেও ছিল আধুনিক, তাই আগের অধ্যায়ে তাকে না ঢোকানোই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

আরব, ঐশ্লামিক বিজ্ঞান

যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর পর যে ঐশ্লামিক সভ্যতার সূচনা পরবর্তী সাড়ে ছয় শো বছর ধরে তার সামগ্রিক বিস্তার ঘটে। আরবীয় বিজ্ঞান বলতে আরবী ভাষায় রচিত বিজ্ঞান-গ্রন্থ-গুলিকে বোঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ আরবীয় বিজ্ঞান ও ঐশ্লামিক বিজ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা হয়। উভয় বিজ্ঞানই কিন্তু

বিস্তৃতি ও মননে দারুণ সমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক কারণে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইশলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জনের প্রয়াসকে স্বাগত জানানো হয়েছে বলে ঐশ্লামিক বিজ্ঞান যেখান থেকে পেরেছে, যতটা পেরেছে সংগ্রহ করে গেছে। সংগ্রহ করেছে আর অনুবাদ করেছে। ঝাড়াই বাছাইয়ের সময় লক্ষ্য রেখেছে কোন্ কোন্ গ্রন্থ, তত্ত্ব ও জ্ঞান সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে তার ওপর। এটা একদিকে যেমন নতুন কিছু আবিষ্কারের পক্ষে বাধাপ্রদ, অন্যদিকে নির্বাচন ও বিশ্লেষণে, যুক্তি ও বিচারমুখী হবার প্রমাণও। বাইজেনটিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রীক ও হেলেনীয় বিজ্ঞানের প্রভাব আরবীয় বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ। পাশাপাশি পারশীয় ও ভারতীয় ভাবধারার প্রক্ষেপ থাকলেও আরবীয় বিজ্ঞানের প্রাথমিক সংবিধান যে গ্রীক বিজ্ঞান নির্দেশিত তা একেবারে ঠিক। ধর্ম ও সমাজবিন্যাসের মত বিজ্ঞানকেও চূড়ান্ত সংগঠনের একটি অপরিহার্য দিক করে তোলার ব্যাপারটি কিন্তু মূলত আরবীয়। তাই আরিস্তটল বিজ্ঞানকে তাত্ত্বিক, প্রযুক্তি ও কাব্য-বিজ্ঞান, এই যে তিন ভাগে ভাগ করে ছিলেন আরবীয়দের হাতে এসে তা হয়ে উঠল (১) ভাষাতত্ত্ব (২) যুক্তিবিদ্যা (৩) গণিত বিজ্ঞান (৪) পদার্থ বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা এবং (৫) আইন, রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্ব। অর্থাৎ এই প্রথম বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা অঙ্গাঙ্গী হল (বিজ্ঞানের অল-ফারাবি কৃত শ্রেণী বিভাজন)। পরবর্তীকালে ইবন-সিনার শ্রেণী বিভাজনে আরও বেশি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রবণতার পরিচয় রয়েছে। দর্শন ও মানব-বিদ্যার সঙ্গে যোগসূত্রটি আরবীয় বিজ্ঞান কখনোই ছিন্ন করে নি, সামগ্রিকতার প্রতি এই টান ছিল বলেই অধিকাংশ আরব বিজ্ঞানী একই সঙ্গে দার্শনিক, জ্যোতিষী, পদার্থবিদ ; চিকিৎসক, জীববিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক।

অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ছিল আরবীয় বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। এর মধ্যে প্রথম দুশো বছরে মুসলমান জনগণ সংঘবদ্ধ হয়েছে ও পরের দুশো বছরে তাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা ও বিজ্ঞানের প্রধান সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রারম্ভে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল

বাগদাদ, পরে ৭৫০ খৃ. থেকে স্পেন ও ৮২৭ খৃ. থেকে সিসিলিতে মুসলমানদের প্রাধান্য শুরু হলে মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে করডোবা।[১২] আরবীয় ও ঐশ্লামিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনুবাদের কাল ও মৌলিক গবেষণার যুগের ভিতর স্পষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন। কেননা শ্রেষ্ঠ বহু অনুবাদকই ছিলেন বিজ্ঞানী, যেমন, হুনায়ন ইবন ইশাক; আবার শ্রেষ্ঠ বহু বিজ্ঞানী নিজেরাও অনুবাদ করেছেন, যেমন, অল বিরুনি। অনুবাদের সময়ও তাঁরা সর্বদাই বিদেশী পূর্বসূরীদের গণনা ও পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষা করে দেখতেন ও প্রয়োজন মত সংশোধন করে নিতেন। বিভিন্ন শাখার মধ্যে, গণিতে, অল কিন্দি (জন্ম ৮০১ খৃ. র পর) পাটিগণিতের সুষম সংখ্যা ও আনুপাতিক রাশি এবং আবহতত্ত্বের গবেষণায়; অল-খোয়ারিজ্‌মি (খৃ. নবম শতক) সংখ্যাকে পাটিগাণিতিক চরিত্র থেকে বীজগাণিতিক সমীকরণে এনে প্রতিষ্ঠায়; অল-কারখি (খৃ. নবম শতক) ঘাত ও বর্গমূল নির্ণয়ে—ইনি দেখিয়েছিলেন সংখ্যা a র বর্গমূলের সবচেয়ে নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যা যদি w হয়, তবে $\sqrt{a} = w + \frac{a - w^2}{2w + 1}$ যা সঠিক মানের বেশ কাছাকাছি; অল-বত্তানি (৮৫০—৯২৯ খৃ.) ত্রিকোণমিতির চিহ্ন, ফাংশন, সদৃশ ও ০ থেকে ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত সাইন, ট্যানজেণ্ট ও কোট্যানজেণ্ট তালিকা রচনায় এবং বর্ষদৈর্ঘ ও বিভিন্ন গ্রহ ও তারকার গতি গণনায়; আবুল ওয়াফা ত্রিকোণমিতির উন্নয়নে; কবি ওমর খৈয়াম ত্রিঘাত সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধানে; ও পদার্থবিজ্ঞানী অল হয়থম ইউক্লিডের জ্যামিতির পর্যালোচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। স্বভাবগতভাবে আর্যরা ও ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে আর্যভাষা জ্যামিতি অভিমুখী আর আরবীয়রা ও আরবীভাষা হল বীজগণিতমুখী। তাই শেষোক্তদের বীজগণিত চর্চায় যথেষ্ট বিমূর্ত অনুভবের পরিচয় থাকলেও তাদের জ্যামিতি কিন্তু পুরোপুরিই গঠনগত ও পাটিগাণিতিক, জরিপ ও অন্যান্য ব্যবহারিক কাজেই যার মূল প্রয়োগ।

অন্যান্য শাখার মধ্যে, জ্যোতিষে, আরবীয়দের বিশেষ কৃতিত্ব

রয়েছে। ধর্মীয় অনুষঙ্গের জন্য জ্যোতিষকে তারা মহত্তম বিজ্ঞান বলে মনে করত। অল বত্তানি ছাড়া, ইবন ইউনুস, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির নির্মাতা অল অস্তুরলবি প্রমুখর নাম এই প্রসঙ্গে করা হয়। জ্যোতিষে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগে তারা যথেষ্ট সফল হয়েছিল। সমুদ্র ভ্রমণের সময় আরবীয় নাবিকরাই, প্রথম, Magellanic মেঘপুঞ্জ নিরীক্ষণ করে। রাশি ও ভবিষ্যৎ গণনার অনুপ্রবেশে আরবীয় জ্যোতিষ শেষ দিকে চরিত্র হারায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে থাবিত ইবন কুড়া, অল তবারি, ইবন মাশাওয়া ও অল বিরুনি রচিত গ্রন্থ সমূহ প্রমাণ করে রোগ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসাপদ্ধতি ও রোগ নিরাময় বিষয়ে আরবীয়দের স্পষ্ট ও প্রখর ধারণা ছিল। ধার্মিক কারণে শবব্যবচ্ছেদ নিন্দনীয় ছিল বলে শরীরের অন্তর্গঠন ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সম্পর্কে অবশ্য তাদের কোন ধারণাই ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানে ইবন-সিনা, দৃগ্‌বিজ্ঞানে অল হাজেন এবং যন্ত্রবিদ্যায় ভার, তূলা, পুলি গতি ও গতিপথ সম্বন্ধে গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবীয়দের জীববিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ছিল আদিম ও বিশৃঙ্খল। উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা যায় যে তারা কখনোই ডিয়োস্করিডের মেটেরিয়া মেডিকার প্রভাব ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে নি। রসায়নে আলকেমিবিদ জাবির ইবন হয়ান ও আরবীয়দের সংগীত চিন্তায় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উল্লেখ করে বিজ্ঞানের শাখাভিত্তিক এই আলোচনায় ইতি টানছি।

বিজ্ঞানকে অধিবিদ্যার অনুমান থেকে পরীক্ষামূলকতা ও প্রয়োগ-মূলকতায় নিয়ে আসার কাজে আরবীয় বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে ব্যবহারিক করে তোলাই ছিল এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তারাই প্রথম বস্তুগত বিজ্ঞান পদ্ধতির সূচনা করে, গ্রীক বিজ্ঞান, ভারতীয় বিজ্ঞান, চীনা বিজ্ঞান, পারসীয় বিজ্ঞান—বিভিন্ন দেশজতায় আবদ্ধ জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানকে তারা আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রতিষ্ঠা দেয়, অল-রাজির বিজ্ঞান গ্রন্থগুলি যে প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চতুর্দশ শতকে ঐশ্লামিক সভ্যতার অবক্ষয়ের পর বিজ্ঞানের

এই আন্তর্জাতিকতা পশ্চিমী সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ওপর বর্তায়, আধুনিক বিজ্ঞান যুগের উৎস ওইখানে। শুধু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদের সূত্রে নয়, সাহিত্যের উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়েও এই বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে, যেমন মীরাবাঈয়ের ভজনের সঙ্গে রাবিয়ার সংগীতের মিল, তেমনি দান্তের ডিভাইন কমেডিতে ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাব। ইসলাম একদিকে ইউরোপের অন্ধকার যুগে বিজ্ঞানকে অন্যত্র বাঁচিয়ে রেখেছে, অন্যদিকে ধর্মযুদ্ধের পাকে পড়ে নিজে অন্ধকারে ঢুকে যাবার আগে সদ্যজাগ্রত ইউরোপের হাতে তুলে দিয়ে গেছে বিজ্ঞানের আধুনিক চেতনা।

ইউরোপের অন্ধকার যুগ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে যে মধ্যযুগের সূচনা, অন্ধকার যুগ (পঞ্চম থেকে দশম শতক) তার প্রথম পর্যায়। সময়টা ছিল অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক ডামাডোল ও বর্বর রীতিনীতির যুগ। সমস্ত ভাবনা চিন্তা যখন ঈশ্বরকেন্দ্রিক করে তোলা গেছিল। গূঢ়বিদ্যার উদ্ভব, সংখ্যা নিয়ে প্রতীকী ব্যাখ্যা আর ধর্ম ও ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে হরেক কুসংস্কার, মননের তখনকার চেহারাটা ছিল এই। ব্যক্তি ও দেশের জীবনে গ্রহ ও নক্ষত্রের যোগাযোগ আর শুভাশুভর বিষয়টি ছিল তখনকার বিজ্ঞানচর্চা। জরমানদের হাতে রোমান রাজত্বের পতন হল, শ্লাভ জাতি আবার ওই জরমানদের লুণ্ঠন করল, যে শ্লাভদের বিতাড়িত করে ছাড়ল হূনরা—শুধু অন্ধকার যুগের এই বর্বর বিশৃঙ্খলা ও খৃষ্টধর্মের গোঁড়ামিই যে বিজ্ঞানের তৎকালীন অবক্ষয়ের জন্য দায়ী নয় বরং নিজের ভেতর থেকেই বিজ্ঞান সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল হেলেনীয় বিজ্ঞানের আলোচনায় তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি। এবার আমরা দেখব এই সংকট সে কাটিয়ে উঠল কীভাবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে অর্থাৎ মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্ধকারের জড়তা থেকে জেগে উঠল ইউরোপ, জনসংখ্যার বিস্তার ঘটল, ব্যবসা বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় স্বতঃস্ফূর্ত হল, ঐশ্লামিক বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার ও গ্রীক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য হাতে এল। ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে আগ্রহ—ইউরোপের নবজাগরণের এই ছিল প্রধান লক্ষণ। মধ্যযুগের তৃতীয় পর্যায়টি (১১৫০-১৩৫০ খৃ.) বিদগ্ধ বিজ্ঞানের কাল। আর চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে (১৩৫০-১৪৫০ খৃ.) বিজ্ঞান রূপান্তরিত হল কারিগরী বিজ্ঞানে (টেকনোলজি)। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে শুধু বিজ্ঞানে নয়, অন্যত্রও ভাব বিনিময় হয়েছে। শিল্প খৃষ্টানদের কাছে ছিল চিত্র, মূর্তি ও প্রতীক নির্ভর। আরবীয় মুসলমানদের পক্ষে কিন্তু মূর্তি অঙ্কন ছিল নিষিদ্ধ ও অধার্মিক, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এই নিয়মে ব্যতিক্রম আনে। ঐশ্লামিক ধর্মীয় ভাবনায় খৃষ্টীয় নৈতিকতার প্রভাব পূর্বোক্ত সংযোগের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ফলরূপে কালক্রমে দেখা দেয়।

১১০০ খৃ. থেকে কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ ব্যক্তি দর্শনের বিভিন্ন মৌলিক প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু করলেন তা ১১৬০ খৃ-এ প্যারিস ও বলোগ্না, ১১৬৭খৃ-এ অক্সফোর্ড, ১২০৯ খৃ-এ কেম্ব্রিজ ও ১২২২ খৃ-এ পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ পেল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সব কটিতেই শিক্ষার বাহন ছিল লাটিন ভাষা। বিদগ্ধ বিজ্ঞানের কাল কিন্তু বিজ্ঞানগত ভাবে তেমন সমৃদ্ধ ছিল না, অধ্যয়ন ছিল নেহাতই কেতাবী, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বদলে ছিল বিজ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় নিয়ে অনর্থক কচকচি।[১৩] এই সাধারণ সীমানা যাঁরা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে গণিতজ্ঞ Savasorda (জন্ম ১১০০ খৃ. নাগাদ), Adelard (জন্ম ১১৭০ খৃ.), পিসার Leonardo (জন্ম ১১৮০ খৃ.) ও Jordanus ; পদার্থবিজ্ঞানী Buridan, Swineshead, Oresme, Chuquet ও Bradwar-

dine উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গের গাণিতিক উপস্থাপনার জন্য খ্যাতিমান। ১২৬৯ খৃ. নাগাদ Maricourt চুম্বকত্ব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ গবেষণাকে ভিত্তি করে যে গ্রন্থ লেখেন বহুকাল ধরে তা এই বিষয়ের উপর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। রামধনুর উৎপত্তি, বর্ণবীক্ষণ ও আলোক-বিজ্ঞানগত তথ্যাদি বিষয়ে যেমন পদ্ধতিসাপেক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন Theodoric। আর Albert Magnus (জন্ম ১২০৬ খৃ.) এই সময়কার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। এই তিন প্রকৃত বিজ্ঞানীর পাশাপাশি ছিলেন Thomas Aquinas (১২২৭-৭৪ খৃ.) যিনি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ও আরিস্তটলের বিজ্ঞানের এক অপ্রয়োজনীয় সংশ্লেষণে প্রয়াসী। অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব। রজার বেকনেরও (১২১৪-৯৪ খৃ.) আগ্রহ, মূলতঃ, ছিল ধর্মতত্ত্বে। অবশ্য এরই সঙ্গে তিনি দৃগ্‌বিজ্ঞান নিয়ে বই লিখেছেন (অল-হাজেন অনুসরণে) ও পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের পক্ষে রায় দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে স্বাধীন করার প্রয়াস, বলা হয়, হয়েছে প্যারিসের আর্চবিশপ ও ক্যান্টারবারির আর্চবিশপের হাত দিয়ে, যখন ১২৭৭খৃ.-এ তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে নিন্দা করে সচেতন বিবৃতি দিলেন।

মধ্যযুগের চতুর্থ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান কারিগরী বিজ্ঞানের প্রাধান্যে পড়ল। হাওয়াকল, জলচক্র, চক্রবাহী লাঙল, কূপখনন, জলশোধন, কাঁচ বারুদ খনিজ অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কলকারখানা, ভারচালিত দেওয়াল ঘড়ি প্রভৃতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এই রূপান্তর এল। কম্পাস ও জাহাজ চালনার রাডার উদ্ভাবনের ফলে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে, নৌপরিবহনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যুগান্তর ঘটল। তারপর ১৪৪০খৃ.-এ যখন জন গুটেনবার্গ স্থানান্তরযোগ্য টাইপের সাহায্যে ছাপার কাজে সক্ষম হলেন তখন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তুত সম্পূর্ণ হল বলা যায়।

আঁকতে গিয়ে মাথার পেছনে ঐশী বলয় বসিয়ে দিচ্ছেন এল গ্রেকো, গ্যালিলিও শুরু করে দিয়েছেন তাঁর মহাজাগতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, রক্ত সংবহন বিষয়ে হার্ভে নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করলেন যখন সেটা ১৬২৮, পদ্ধতি বিষয়ে দেকার্তের মতামত প্রকাশিত হল—১৬৩৭, রসায়নবিদ বয়েলের বয়স তখন দশ, দার্শনিক স্পিনোজার তিন, নিউটনের জন্ম নিতে মাত্র পাঁচ বছর বাকি, লাইবনিৎসের নয় বছর।

কারিগরী, আর্থনীতিক ও ব্যবসায়িক প্রসঙ্গের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান উদ্দেশ্য ও অধ্যয়নগত, দুইভাবেই, বাস্তববাদী হয়ে উঠল। বিশ্বাস নীতি অনুভব নিরপেক্ষভাবে সমস্ত মানুষের কাছে বিজ্ঞান গ্রহণযোগ্য হতে পারল। যে যার মতো করে নিজের আদর্শের সমর্থন পেয়ে গেল বিজ্ঞানের ভেতর। সতেরো শতকে বিজ্ঞান গবেষণার একটা নতুন ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটল, প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে, গাণিতিক ও যন্ত্রবিদ্যায় ব্যাখ্যা-যোগ্য, এক বিস্তৃত তত্ত্বের যা কালক্রমে বিপুল প্রসারে সক্ষমরূপে নিজেকে প্রমাণ করেছিল। ইতিহাসের বস্তুবাদী, মার্কসীয় ব্যাখ্যায় ঘটনাধারার বিচার হয় অর্থনীতি ও মানবের প্রয়োজনের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বলা যায়, সতেরো শতকের বিজ্ঞানবিপ্লবের জন্য দায়ী এক অর্থ নৈতিক কারণ—সামন্ততন্ত্রের অবসানে ধনতান্ত্রিক, বুর্জোয়া শাসিত এক industrial সমাজ ব্যবস্থার জন্ম।[১৫]

আধুনিক বিজ্ঞানের (১৮০০ পর্যন্ত) উদ্ভব

বিজ্ঞানবিপ্লব আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছিল, জন্ম দিয়েছিল এমন এক বিজ্ঞানের যা পূর্ববর্তী বিজ্ঞান থেকে মূলগতভাবে আলাদা। শুধু তাই নয় আধুনিক বিজ্ঞানের অব্যাহত ক্রমবিকাশের উৎসটিও ওখানেই, যে বিষয়ে আলোচনার আগে বিজ্ঞানের একাধিক বিশেষ শাখা ও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সম্পর্কে কিছু বলা জরুরী মনে করি।

গণিতে অগ্রগতি, জরমন ও ইটালিয় অবদান

পনেরো শতক থেকেই বীজগণিতে আধুনিক সমৃদ্ধির শুরু। এই অগ্রগতিতে প্রথম অবদান Chuquet ও Pacioliর। বিভিন্ন ধরনের রাশি ও সমীকরণ, ইনডিটারমিনেট সমীকরণ ও সমীকরণের ঋণাত্মক সমাধান, সমান্তর ও গুণান্তর শ্রেণীর সঠিক সংজ্ঞা এবং তাদের গাণিতিক সম্পর্ক, লগারিদমের আদি সূচনা, সূচক অঙ্কপাতন সম্পর্কিত ধারণার বিস্তার আর গণিতে পরিভাষার অনবদ্য গ্রন্থনা—Chuquet-এর সাফল্য নানা বিষয়ে। অন্য দিকে দা ভিঞ্চির বন্ধু Pacioli মূলতঃ সঙ্কলক, তিনি কাজ করেন গাণিতিক ধাঁধা, মেট্রিক জ্যামিতি, বাণিজ্যিক পাটিগণিত ও পঞ্চতলক পর্যন্ত আকৃতির তত্ত্ব নিয়ে।

গণিতে ষোড়শ শতাব্দীর জরমন অবদান প্রধানতঃ অঙ্কপাতন সংক্রান্ত সংস্কারের জন্য। ওয়ার্নার শংকু বিষয়ে প্রথম মৌলিক গবেষক, এ ছাড়া ত্রিকোণমিতিতে তাঁর যে কালজয়ী আবিষ্কার, আধুনিক সংকেতে তা এরূপ : $\sin\alpha.\sin\beta=\frac{1}{2}\ [\cos\ (\alpha-\beta)-\cos\ (\alpha+\beta)]$ ও $\cos\alpha.\cos\beta=\frac{1}{2}\ [\cos\ (\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$। শিল্পী ড্যুরার স্কেল ও কাঁটা কম্পাস দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্ররেখা ও জ্যামিতিক আকার অঙ্কনের কিছু মূল ও সহায়ক সূত্র লিপিবদ্ধ করেন। জরমনরা পরিমিতি, বীজগণিতের coss সূত্র, পাটিগাণিতিক বা পাস্কাল ত্রিভুজ, স্থানীয় সময়ের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয়, $x^n.x^m=x^{n+m}$, $(n\leq o)$ সূত্র প্রভৃতি নিয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন।

ইটালিয় গণিতজ্ঞদের প্রধান অবদান বীজগণিতে। সবচেয়ে মৌলিক ও দূরগামী অবদানটি হল Ferro, Tartaglia, Cardan এবং Ferrari কৃত $x^3=ax+b$ ধরনের ত্রিঘাত ও আরও জটিল চতুর্ঘাত সমীকরণের সমাধান। Tartaglia পাস্কাল ত্রিভুজকে সমবায় সম্পর্কিত বিশ্লেষণের সমস্যা সমাধান করার কাজেও লাগিয়েছিলেন। ইটালিয় বীজগণিত তার শীর্ষে পৌঁছয় Bombelli-র আমলে, ইনি

চোদ্দ শতক থেকেই ইটালির নাগরিক জীবনে বণিক, ব্যাঙ্কার শিল্পপতি প্রভৃতি বুর্জোয়ারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের ফলে তখন যে নতুন অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে তাতে [illegible] ভূমিকাই প্রধান। সামন্তদের জীবনধারা ও ধর্মযাজকদের দৃষ্টিভংগির সঙ্গে তাদের দুস্তর ব্যবধান। চার্চের নির্দেশে নয়, বরং বিভিন্ন বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগেই তাদের প্রয়োজন। তত্ত্বের কচকচি নয়, হাতে কলমের পরীক্ষাতেই তাদের আকর্ষণ। এই অবস্থা ইটালি ও ইউরোপের অন্যত্র এমন একদল বুদ্ধিজীবী মানুষের আবির্ভাব ঘটাল যাঁরা মানবতাধর্মী, বহু বিদ্যায় আগ্রহী, ঐহিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতেই তাঁদের জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টি। হল নতুন যুগ ও নতুন সংস্কৃতির সূচনা। রেনেশাঁস। বোকাচ্চিয়ো ও পেত্রার্কার রচনায়, ভাস্কর ও স্থপতিদের জীবনমুখী প্রাণময় শিল্পসৃষ্টিতে, ম্যাকিয়াভেলির যুগধর্মী রাষ্ট্রতত্ত্বে আর তৎকালীন বিজ্ঞানে তারই প্রকাশ। একে সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে সমাজের উদ্দেশ্য অনুপ্রেরণা ও কর্মধারা; ললিতকলার বিষয় ও শৈলী; ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রয়োগের বহুমুখী পরিবর্তন বলে। নতুন কেম্ব্রিজ আধুনিক ইতিহাস গ্রন্থে রেনেশাঁস কাল বলতে বলা হয়েছে ১৪৯৩ থেকে ১৫২০ খ্রী. পর্যন্ত সময়কে। ড. মেরি বোয়াস আবার তাঁর বিজ্ঞানের রেনেশাঁস বইয়ে বিজ্ঞানের নব প্রসঙ্গে ১৪৫০ থেকে ১৬৩০ খ্রী. পর্যন্ত সময়ের উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকরা যে সব বৈশিষ্ট্যকে রেনেশাঁস শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন, মনে হয়, ১৪০০ খ্রী.-র কিছু আগে থেকেই তার সূচনা ও অন্ততঃ ইটালিতে ১৫৫০ খ্রী.-র বেশ কিছু আগেই তার অবসান। এর অর্থ ড. বোয়াস রেনেশাঁসের কালকে বিস্তৃত করে বিজ্ঞানে বিপ্লব-এর সূচনা অবধি টেনে নিচ্ছেন, যার প্রকাশ সতেরো শতকের প্রথমার্ধে। যে সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ শুরু হল।

অর্থ, প্রতিন্যাস ও সামাজিক প্রভাবের বিচারে রেনেশাঁয় বিজ্ঞান ধ্রুপদী বিজ্ঞান হতে সেই মাত্রায় আলাদা, সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান থেকে যতটা। এই বিজ্ঞান ও তার কর্মকলাপ একই সঙ্গে ছিল উচ্ছ্বাসময় ও উত্তেজক। দূরপ্রসারী সৃজনশীলতা ও মধ্যযুগের উৎকেন্দ্রিক কল্পনার এক সরস সংমিশ্রণ। মানবতা ও বহুমুখীনতা হল এর প্রধান দুই বিশেষত্ব। সব মিলিয়ে বলা যায় এই বিজ্ঞানের যোগ্যতম প্রতিনিধি হলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), উভয়ার্থে ; যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করেছি। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ চর্চার প্রচলন হয়েছিল বলেই রেনেশাঁসের গুরুত্ব। বিজ্ঞানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথায় বলা যায়, প্রথম থেকেই এই বিষয়ে ফ্রান্সের অবদান আর সব দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আর্চবিশপ অফ প্যারিসের কথা আগে বলেছি, এখন ফরাসী বিপ্লবের পর ঐ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পাঠক্রমের কথাও উল্লেখ করা যায়।[১৪]

বিজ্ঞানে বিপ্লব

বিজ্ঞানবিপ্লবের বীজটি বপন করে গেছিলেন কোপারনিকাস যখন ১৫৪৩ খৃ.-এ আবর্তন বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর একশো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানের জগতে এক মৌল ও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সতেরো শতকের রাষ্ট্রনৈতিক রূপান্তর ও রাজনৈতিক পরিবর্তন মনন ও বিজ্ঞানের জন্য এক উর্বর পরিবেশের জন্ম দিল, ব্যক্তি-গুরুত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দরুণ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দারুণ ব্যক্তিক উৎকর্ষ দেখা গেল। ১৬০০ খৃ.-এ চুম্বক নিয়ে গিলবার্টের যুগান্তকারী গ্রন্থ, ১৬০৪য়ে হ্যামলেটের প্রাথমিক সংস্করণ, ১৬০৫য়ে ডন কুইকজোট, অচিরে জন্ম নেবেন রেমব্রাণ্ট ও মিলটন, ১৬০৮য়ে টেলিস্কোপ, ১৬০৯য়ে গ্রহের গতি ও গতিপথ সম্পর্কে কেপলারের সূত্র, যখন শিল্পজীবন শুরু করতে যাচ্ছেন রুবেন্স, আত্মপ্রতিকৃতি

অসম ; এবং সূর্যের চারপাশে একবার সম্পূর্ণ আবর্তিত হয়ে আসতে একটি গ্রহের যে সময় লাগে তার বর্গ ও সূর্য থেকে ঐ গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের অনুপাত প্রতিটি গ্রহের ক্ষেত্রে সমান। মহাজাগতিক এই সিদ্ধান্তের পিছনে গিলবার্টের চৌম্বকত্বের দান আছে। কেপলার পৃথিবীকে একটি বিশাল চুম্বক বলে অনুমান করেছিলেন এবং চুম্বকীয় আকর্ষণ তত্ত্বকে আমাদের সৌরমণ্ডলের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে আধা ধর্মীয় জ্যোতিবিজ্ঞানকে নিউটনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে যোগসূত্রের কাজ করেছেন। বিপ্লবকালীন বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই দ্বিতীয় যোগ-সূত্রটি হল অবস্থানানুপাতের গবেষণায় গণিতকৌশলের প্রয়োগ।

বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের ত্রিধারা

বিজ্ঞানে বিপ্লবের কালে প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার কাজে তিনটি মূল বৈজ্ঞানিক ধরন দেখা গেছে, যার প্রতিটিতেই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়েছে ও প্রতিটি ধরনই আজ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। জৈব, অতীন্দ্রিয় ও অধিযন্ত্রবাদী—এই তিন ঐতিহ্যের প্রথমটি ছিল জৈবগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থাৎ জীববিদ্যা কেন্দ্রিক। হার্ভের রক্তসংবহন ও হৃদ্‌পিণ্ডের শারীরিক প্রাধান্য বা Malpighi-র ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এই ঐতিহ্যানুসারী। অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্য প্রকৃতিকে এক বিপুল শিল্পবস্তুর মতো করে গ্রহণ করেছিল, গণিত ও জ্যোতির্বিদার প্রতি তার মূল আকর্ষণ। হেলমণ্টের ফারমেনটেশন নিয়ে গবেষণা বা মোরের ইউটোপিয়া (১৫১৫) এই ঐতিহ্যের। অধিযন্ত্রবাদী ঐতিহ্যই শেষ পর্যন্ত প্রধান ও বলা যায় একমাত্র হয়ে ওঠে। তা সমস্ত কিছুকে চেয়েছিল যান্ত্রিক অনুষঙ্গে ফেলে বিচার করতে, যন্ত্রবিদ্যার সূত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করতে। এই গণিত ও যন্ত্রবিদ্যাগত যৌথ পদ্ধতিই ছিল এর মূল চরিত্র যা বলা যাবে কিছুটা আর্কেমিদিস-অনুপ্রাণিত। আগেই বলেছি যে এই ঐতিহ্যটিই কালক্রমে বিপুল প্রসারণক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। যন্ত্র বিপ্লবের ফলে

যন্ত্রের বিপুলতর ও ব্যাপকতর ব্যবহার ঘটে, অর্থনীতি যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, ফলে স্বভাবতই বিজ্ঞানী ও এমনকি চিকিৎসকরাও যন্ত্রবিদ্যার অনুষঙ্গে গবেষণার বিষয় খুঁজে পেতে আগ্রহী হন (যেমন হৃদ্‌পিণ্ড তাদের কাছে মূলত একটা পাম্প) ও এইভাবে বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিক উভয় কারণেই অধিযন্ত্রবাদী ঐতিহ্য বিজ্ঞানের মূল উৎস ও ধারা হয়ে ওঠে। গ্যালিলিও থেকে নিউটন পর্যন্ত বহু সেরা বিজ্ঞানী এই ধরনটির অনুসারী। জৈব ঐতিহ্যের কোন স্থান এঁদের মনে ছিল না, শুধু অতীন্দ্রিয়বাদ এঁদের কাছে মাঝে মাঝে ব্যসন হয়ে দেখা দিয়েছে, যেমন যুক্তিবাদীর মনে কখনো বা উঁকি মারে রোমান্টিকতা। এই ব্যসন ক্ষমার্হ। কেননা প্রথম দুটির কথা তো ওঠেই না, তৃতীয় ঐতিহ্যটিও কিন্তু প্রকৃতির ধর্মকেন্দ্রিক ধারণা থেকে নিজেকে একেবারে মুক্ত করতে পারে নি। যাই হোক অধিযন্ত্রবাদী বিজ্ঞান কালে ইটালির বাইরে অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে, এই প্রসঙ্গে ফরাসী Mersenne-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রবিদ্যার জন্ম : গ্যালিলিও, দেকার্তে, পাস্কাল

অধিযন্ত্রবাদ আর যন্ত্রবিদ্যা, দেখা গেছে, একে অপরের সাথে যুক্ত। যন্ত্রবিদ্যার জন্ম ও প্রসারে প্রথম মনে আসে গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২) কথা। পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গাণিতিক সূত্রটি তাঁর প্রথম আবিষ্কার, বস্তুর ত্বরণ বিষয়ে এই বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে তিনি এরপর উর্ধ্বে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুর গতিকে বিশ্লেষণ করেন। গবেষণার তিনটি অতি দরকারী দিক, পুনরাবৃত্তি বিশুদ্ধি ও দক্ষতা সম্বন্ধে গ্যালিলিও সমান সচেতন ছিলেন। তাঁর জগত ছিল দ্রুতি সময় ও দূরত্বের এককে বাঁধা, অর্থাৎ যন্ত্রবিদ্যার জগত। টেলিস্কোপের সহায়তায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর একাধিক আবিষ্কারও রয়েছে। যন্ত্রবিদ্যার মূল সূত্রগুলির দ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত এটা অনুমান করেছিলেন বলে তাঁর বৈজ্ঞানিক মূল্য কালজয়ী। যে

অমূলদ সংখ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও যে সব ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান এতদিন অসম্ভব ছিল তাদের বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেন, ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মত দিয়েছেন। আলোকবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ, বিভিন্ন আকারের বস্তুর ভারকেন্দ্র নির্ণয়, গাণিতিক উপপাদন নিয়ে প্রথম উল্লেখ, ও গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারের সংস্কারের জন্যও এঁরা প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতকে বীজগণিত ভাষানির্ভর অলংকরণ থেকে হ্রস্বীকৃত বীজগণিতে উন্নীত হয়, তাকে প্রতীকী বীজগণিতের উন্নততর রূপ পাওয়ার জন্য সপ্তদশ শতকের ভিয়েটা ও দেকার্তে অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই রূপান্তরের প্রাথমিক ক্ষেত্র ইটালিয়দের অবদানের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছিল বলা যায়।

ওই সময়ের আর যে গণিতজ্ঞের নামোল্লেখ জরুরি তিনি ডাচ বিজ্ঞানী স্টেভিন। দশমিক ভগ্নাঙ্কের সুসম্বদ্ধ প্রয়োগ, সংখ্যাকে বিশুদ্ধ বীজগণিতের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে ১-এর পরিবর্তে ০কে নিয়ন্ত্রক হিশেবে গ্রহণ আর ধনাত্মক সংখ্যার বিয়োগকে ঋণাত্মক সংখ্যার যোগের সাথে সমার্থক রূপে ধরা তাঁর প্রধান কয়েকটি সাফল্য। গণিত তখন উদাহরণ ও নিয়ম ভিত্তিক, বিশুদ্ধ সূত্রের সময় তখনও আসে নি।

দা ভিঞ্চি, কোপারনিকাস, কেপলার, (ব্রাহে, ব্রুনো)

দা ভিঞ্চির শিল্পী-প্রসিদ্ধি ও বিজ্ঞানচেতনার ঔৎকর্ষ—একটি অন্যটির সঙ্গে তুলনীয়। একদিকে তিনি প্রকৃতির ধীর, ধারাবাহিক যুক্তিবাদী পর্যবেক্ষক, অন্যদিকে অনবদ্য যন্ত্রকুশলী কারিগর। একদিকে জল, বায়ু, উদ্ভিদ, মাটি, আলো, শরীরসংস্থান, গতিবিদ্যার নানান্ দিকের আনুপাতিক বর্ণনা ও অঙ্কন, অন্যদিকে বহুবিধ অস্ত্র, যন্ত্র, যন্ত্রযান ও ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলের সতথ্য বিবরণ। এর চেয়েও বড় কথা তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রথম আধুনিকমনস্ক দার্শনিক। প্রকৃতির নিয়ম-

গুলিকে জানা ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রাকৃতিক প্রয়োজন বলে তিনি রায় দিয়েছিলেন, যা আধুনিকতা। বিপ্লবকালীন বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথম যোগসূত্রটি হল দা ভিঞ্চি সুলভ এই আনুপাঙ্ক্ষিক প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ।

পোল্যাণ্ডের কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) সৌরমণ্ডল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে আলোড়ন তুলেছিলেন তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র হিশেবে সূর্যকে কল্পনা করেছে, বলেছে—সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়, পৃথিবীই নির্দিষ্ট বার্ষিক আবর্তনে সূর্যের চারপাশে গতিশীল ও প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের অক্ষের উপরও একবার আবর্তিত হয়, ফলে দিন থেকে রাত ও রাত থেকে দিন হয়। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু প্রচলিত পর্যবেক্ষণকে পরিমার্জিত করেন।

এই অভিঘাতী সিদ্ধান্ত স্বভাবতই সমর্থনের বদলে বিরোধিতা পায় বেশি। পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ব্রাহে, যাঁর সংগ্রহে ছিল নভোতথ্যের এক বিপুল ভাণ্ডার, কোপারনিকাসের মতকে অবাস্তব ও বিধার্মিক বলে রায় দিয়ে বসেন। জ্যোতির্বিদ ব্রুনো কোপারনিকাসের মূলত-গাণিতিক-বিচারকে ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে, একে সাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলেন ও চার্চের বিশেষ বিরাগভাজন হয়ে চার্চের হাতে পুড়ে মরেন। তাঁকে পুড়িয়ে মারার যথেষ্ট প্রয়োজন ধর্মযাজকদের ছিল না, কেননা ধর্মের মূলগত বিরোধিতা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। মহাবিশ্ব অসীম, তার অস্তিত্ব সৃষ্টির অতীত ও অনন্তকাল ধরে বিরাজমান, এই মহাজগতের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই আর নক্ষত্ররা আসলে সূর্য—তাঁর এই সব ঘোষণা কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক ও কতটা দর্শননির্ভর এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

জারমানির কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) অবদানে বিজ্ঞান আবার মৌলিকভাবে সমৃদ্ধ হল। ব্রাহের বিপুল তথ্য কাজে লাগিয়ে কেপলার তাঁর প্রসিদ্ধ তিনটি সূত্রে বললেন, বিভিন্ন গ্রহের গতিপথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তক ; নিজ নিজ কক্ষপথে গতিশীল গ্রহগুলির বেগ

প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব নিরূপণ করেন। গতিবিদ্যার এইসব সূত্র তিনি মহাজাগতিক বস্তুসমূহ ও তাদের বিভিন্ন অনুষঙ্গে প্রয়োগ করেন। দেখান, মহাকর্ষ যে কোন বস্তুর আভ্যন্তরীণ ধর্ম, ও অভিকর্ষ-সূত্র সমস্ত মহাজগতের প্রতি প্রযোজ্য। তত্ত্ব প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণগত আবিষ্কার, জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিনটি দিকেই এত বিস্তৃত অবদান দ্বিতীয় আর কোন বিজ্ঞানীর আছে বলে জানা নেই। জলগতিবিদ্যার সূচনাও তাঁরই হাতে, সান্দ্রতা ও বায়ুমণ্ডলীয় রোধ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বহু যুগ পরে ডুবোজাহাজ ও উড়োজাহাজের মডেল নির্মাণের কাজে সাহায্য করল। যুগ যুগ ধরে কাজে লেগেছে নিউটন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যাও। অন্তরকলন সমাকলন ও fluxions পদ্ধতি গণিত-গবেষণা ও গণিতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনল মৌল পরিবর্তন। চলরাশি ও দ্রুত পরিবর্তনশীলতার অনুশীলনে এর চেয়ে সহায়ক পদ্ধতি আর কিছু নেই। বাইনোমিয়াল উপপাদ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণী জ্যামিতির প্রারম্ভিক বিকাশ, দৃগবিজ্ঞানে আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে পরীক্ষা, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো কীভাবে যন্ত্রবিদ্যার নীতি অনুসরণ করে—দেখানো, ও সূর্যের আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে নানান বর্ণের আলোয় বিভক্ত করে প্রমাণ করা যে সাদা আলো আসলে বিভিন্ন মৌলিক বর্ণের আলোকরশ্মির এক সমন্বয়—এ সবও নিউটনের কৃতিত্ব।

১৬৮৭ খৃ.-এ তাঁর মহাগ্রন্থ প্রিন্সিপিয়ার প্রকাশকে সভ্যতার এক অন্যতম ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয়েছে, it lay in finding the mathematical method for converting physical principles into quantitatively calculable results confirmable by observation, and conversely to arrive at the physical principles from such observations.[১৬] সমগ্র মহাজগত সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ তাঁর এই তত্ত্ব প্রকৃতি-বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও দর্শন বিষয়ে মানুষের ধারণাকে আমূল পরিবর্তিত করে ও বিংশ শতকে আইনস্টাইনের হাত দিয়ে নতুন তত্ত্বের

প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের গবেষণায় কেন্দ্রীয় মোটিফ হিশেবে উপস্থিত থাকে।[১৭]

নিউটনের সমসাময়িক আর এক দিকপাল মনীষী লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬) একই সঙ্গে ছিলেন বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আইনবিদ এবং স্বদেশ জারমানির রাষ্ট্রনৈতিক উপদেষ্টা। কলনবিদ্যার আবিষ্কারক তিনি না নিউটন—এই নিয়ে আজও বিতর্ক হয়। গাণিতিক প্রজ্ঞার বিচারে তিনি যে নিউটনের চেয়ে কোন অংশে কম নন এ সত্য বিতর্কের উর্দ্ধে। সমাকলনে তাঁর বিশাল অবদান; অন্তরকলন পদ্ধতির সহায়তায়, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মির গতিপথের পরিবর্তন বিষয়ে, ফারমাটের সমস্যার সমাধান; দুটি ফাইনাইট রাশির যোগফলের পার্থক্য, গুণফল ও ভাগফলের গণনা এবং সেই গণনাকে ইন্‌ভারস ট্যান্‌জেন্টের মত বিভিন্ন জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক অনুষঙ্গে প্রয়োগ; আর কলনপদ্ধতিকে গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যার মধ্যে যোগসূত্র তৈরির কাজে লাগানো—গণিতে এগুলি তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি। ফাংশন সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত বিমূর্ত ধারণারও তিনি অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর ও নিউটনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সতেরো শতকে গণিতের যে বিপুল কালোপযোগী সংশ্লেষণ ও রূপান্তর ঘটে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা অদৃষ্টপূর্ব। যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, লাইবনিৎসের দর্শন কিন্তু ছিল সঙ্কীর্ণ ও অতীতমুখী, আধা মরমিয়াবাদের শিকার। এই দর্শন নিউটন-লাইবনিৎস বিতর্কের মূল কারণ।[১৮]

বিজ্ঞানবিপ্লবের সামাজিক পটভূমিকা, এই বিপ্লবের সামগ্রিক প্রভাব

ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও অভিজাত (বুর্জোয়া) শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্যের সঙ্গে বিজ্ঞান-বিপ্লবের সংযোগের কথা আগে বলেছি। সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে ধনতন্ত্র এক অন্যতম কিন্তু সাময়িক পর্যায়,

অনুমান নিউটনের হাতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ পায়।

দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) বিজ্ঞানের প্রতি অবদানকে কিন্তু দুটো পৃথকভাগে ভাগ করতে হবে। এক তাঁর যন্ত্রবিদ্যা—যে সব সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তিনি নিজে পরীক্ষা করে দেখেন। দুই মহাজগত সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক, আপাত বৈজ্ঞানিক ধারণা যা সমসময়ে যথেষ্ট প্রভাবশীল ও কালক্রমে সম্পূর্ণ বিস্মৃত। যন্ত্রবিদ্যায় সজ্ঘাত, অভিকর্ষ ও স্থিতিবিদ্যা বিষয়ে তাঁর কাজ যতটা না মূল্যবান অধিযন্ত্রবাদী দর্শনে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে উদ্দীপিত করা তার চেয়ে বেশি কাজের বলে মনে করা হয়েছে। ওই দর্শনে একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে রূপ দেওয়ার কাজে তাঁর প্রয়াস দেখা যায়, যা ছিল এ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস। পদ্ধতি বিষয়ে মতবাদ ও দর্শন বিষয়ে মহাগ্রন্থ, দুটিতেই তাঁর মূল লক্ষ্য দর্শনসম্মত, বস্তুতঃ প্লেটোর পর পাশ্চাত্ত্যে আর কারো লেখায় দেকার্তের মত সাহিত্য সুষমা, মানবিক আগ্রহ ও দর্শনবোধের সমন্বয় ঘটে নি। দর্শনে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানীর মতোই যুক্তিবাদী।

পাস্কাল (১৬২৩-৬২) বায়ুর ওজন ও চাপ ও শূন্যের অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন, তরল পদার্থের সুস্থিতি (জলস্থিতিবিদ্যা) ও সাইফন ব্যারোমিটারের আদিরূপ নিয়ে অনুশীলন করেন। যন্ত্র-গণক সহ নানা প্রকার যন্ত্রও তিনি তৈরি করেছেন।

আর যাঁদের হাত দিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক ও প্রায়োগিক দিকটির সমৃদ্ধি ঘটেছে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) তাঁদের অন্যতম। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন আইনজ্ঞ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, নীতিবাদী। তত্ত্ব ও প্রয়োগকে তিনি সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানে, করতে পেরেছিলেন নিজের রচনায়। তাঁর লেখায় উল্লিখিত বিভিন্ন তত্ত্বের মূল উৎস অকথিত রেখে তিনি নিজের মৌলিকতা অতিরঞ্জিত করেছেন, অনেকের অভিযোগ। এদের মতে বেকনের অবদান যত না বিশিষ্ট, অন্যরা তাঁকে জরুরি মনে করায় তিনি তার চেয়ে বেশি বিশিষ্টতার দাবীদার। তবু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের তিনিই মূল প্রবক্তা।

এই সঙ্গে আসবে বয়েল (১৬২৭-৯১) ও হিউজেনস (১৬২৯-৯৫)-এর কথা। বয়েল ও হুক Von Guericke-এর বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের পরীক্ষার উন্নতি সাধন করেন ও প্রমাণ করে দেখান যে বায়ুশূন্য পাত্রে কোন শব্দের উৎপত্তি হলে তা শোনা যায় না, অর্থাৎ শব্দ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয় বাতাসের মাধ্যমে। বাতাসের সংনম্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে বয়েল পরীক্ষা করেন ও তাঁর সংগ্রহ করা তথ্যকে ভিত্তি করে এই সূত্র রচিত হয় যে কোন গ্যাসের আয়তন, তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার চাপের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় যা বয়েলের সূত্র নামে পরিচিত। গ্যালিলিও বা দেকার্তের মত গণিতজ্ঞান তাঁর ছিল না, তাই যন্ত্রবাদকে তিনি মূলতঃ রাসায়নিক পরীক্ষার কাজে লাগান। নতুন ধরনের পরীক্ষা উদ্ভাবনের ধৈর্য ও সৃজনশীলতা তাঁর ছিল এবং অনুমান নয়, পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তিনি। হিউজেনস দুটি সম ও অসম বস্তুর সংঘাত, বস্তুর ভারকেন্দ্র ও মহাকর্ষজ ত্বরণ এবং বৃত্তাকার দোলক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন। দৃগবিজ্ঞান ও গণিতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁর বিশেষ সাফল্য আছে। কেন্দ্রাতিগ বলের সূত্রগুলি এঁর আবিষ্কার।

নিউটন, লাইবনিৎস

মহাজগত সম্পর্কে অধিযন্ত্রবাদী ধারণা (পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তখন যা ছিল ভিত্তিস্বরূপ) পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল নিউটনের কালজয়ী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) গতিবিদ্যা, মহাজাগতিক বলবিদ্যা, দৃগবিজ্ঞান, গণিত যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই সফল। গ্যালিলিও-র সূত্র তিনি পতনশীল বস্তু ও গ্রহমণ্ডলীর গতি উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য করে দেখান। গতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ তিন সূত্রে তিনি স্থিতি ও গতি জাড্যের সংজ্ঞা, রৈখিক ভরবেগ পরিবর্তনের হার এবং প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত

ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে বিতর্ক ছিল তেমন একটা ক্ষেত্র। এ প্রসঙ্গে বাইবেল ও দৈবঘটনার বিরোধিতায় স্পিনোজার ঝাঁঝালো সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। সব নিয়ে পাশ্চাত্ত্যের চিন্তা ও জীবন-প্রণালীতে বিজ্ঞানবিপ্লবের প্রভাব সুদূর-প্রসারী।

এই সময়ে নানান্ বৈজ্ঞানিক সংস্থা—লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি (১৬৬২), ফরাসী রয়্যাল অ্যাকাডেমি (১৬৬৬) ইত্যাদি—স্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, প্রতিষ্ঠা পায় বিভিন্ন ফিলোজফিক্যাল সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহু বৈজ্ঞানিক বিতর্ক, আলোচনা ও অনুশীলনের সুযোগ করে দেয় সোসাইটিগুলো, তাদের কার্যবিবরণী প্রকাশ পেতে থাকে, ও পাঠ্যপুস্তকের আওতার বাইরে যে পাঠকমণ্ডলী তাকে বিজ্ঞানে আগ্রহী করার চেষ্টা এই প্রথম শুরু হয়। বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসার মতো, অধ্যয়ন, অনুশীলন ও পেশার এক প্রাতিষ্ঠানিক সত্র হয়ে ওঠে। নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের স্বীকৃতির প্রশ্নে প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান পত্রিকাগুলো বিচারকের ভূমিকা নেয়। বিজ্ঞান-বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক প্রভাবে অনতিকালের মধ্যে আর যে সব সমৃদ্ধি দেখা দেয় তা হল রোগ নিরাময়ে ও ওষুধ তৈরিতে সংস্কার সাধন, কৃষিতে নানা উন্নয়ন, পরিসংখ্যানের পদ্ধতিকে অর্থনীতিতে প্রয়োগ (যা রাজনৈতিক পাটি-গণিত নামে পরিচিত) ও শিল্পোন্নয়ন, যার কথা আগেই বলেছি। শিল্পের প্রাথমিক বিকাশের জন্য দায়ী শিল্পপতিরা অনেকেই বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞানবিপ্লব ইংল্যাণ্ডে যেমন, তেমনটি ইউরোপের অন্যত্রও ঘটেছিল। রয়্যাল সোসাইটির প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে বেকনের মতবাদ প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনের গুরুত্ব প্রধান হয়ে পড়ে। ইউরোপের অন্যত্র দেকার্তের মতবাদ স্বীকৃতি পায় বেশি, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আগ্রহ সেখানে প্রধান হয়। ফলে পরে ইউরোপের অন্যত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আবিষ্কার বেশি হয়েছে, আর ইংল্যাণ্ডে হয়েছে মূলতঃ কারিগরী আবিষ্কার—বস্ত্রশিল্প, লোহার

বিগলন, বায়ুচালিত ইঞ্জিন, পথ খাল যানবাহনের উন্নতি। ফলে যন্ত্রবিপ্লব জন্ম নিয়েছে ইংল্যাণ্ডেই যেখান থেকে তা কালক্রমে ইউরোপের অন্যত্র, বিশেষতঃ ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সার্বিক আলোকন বিজ্ঞানবিপ্লবেরই প্রভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির শতক-ওয়ারি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে A. E. Heath লিখেছেন, There's a certain disconnectedness in the science of the 16th Century. Discoveries were the result of a sort of spasmodic inventiveness. In the 17th, instances of inter-connection and co-operation multiply. This increasing co-operative and cumulative character of science is reflected in the appearance of the great European Academies of Science, Whitehead called it the century of genius. In the 18th, the method of balanced reflection, which had already been applied so brilliantly to mechanics, was directed to various physical forces and to the field of chemical fact. In the 19th, it was the turn of biology and that of mind and society. আঠারো শতকের বিজ্ঞান যাত্রা শুরু করেছিল নতুন উৎসাহ নিয়ে। দুই প্রকার কলন পদ্ধতিকে বিস্তৃত ও সমন্বিত করা হল, বিভেদক সমীকরণ ও পরিবৃত্তি-কলনকে প্রয়োগ করা গেল জলগতি-বিদ্যা ও স্বনবিদ্যার অনুশীলনে। গণিত-বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক সীমানা ছাড়িয়ে আরও বেশি করে প্রযুক্ত হতে লাগল কারিগরী ও শিল্পক্ষেত্রে। পরিসংখ্যানে সম্ভাবনা তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করল। দেকার্তের মতবাদকে সরিয়ে নিউটনের পদার্থবিজ্ঞান ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাপ

এই ধনতন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে তখন যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যা বিজ্ঞানের তৎকালীন সমৃদ্ধির জন্য দায়ী, সেই অগ্রগতি কিন্তু প্রগতির ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ওই পরিবেশে আর একটি ব্যাপার ঘটেছিল, তা হল কারিগরী বিজ্ঞানের উন্নয়ন। ব্যবহারিক কলাকৌশলে দ্রুত পরিবর্তন বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও প্রতিদানে বিজ্ঞান কলাকৌশলের আরও দ্রুত ও ফলপ্রদ পরিবর্তনে সহায়তা করে, দুইয়ের এই সংযোগ বিজ্ঞানবিপ্লবের পরবর্তী মূল ঘটনা যন্ত্রবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। জলকল বায়ুকল, দেওয়াল ও পকেট ঘড়ি, কম্পাস রাডার, কলম্বাস প্রমুখের সমুদ্রাভিযান, বারুদ কামান, লেন্স চশমা, কাগজ ও মুদ্রণ, পাতন, মদ্য মৃৎশিল্প সিল্ক কাঁচ, খনিতে ব্যবহারযোগ্য লীভার ও গীয়ার, খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু নিষ্কাশন আর ধাতু ও পারদের ব্যবহার, তুলাযন্ত্র ও প্রজেকটর, কয়লার প্রচলন মারুতচুল্লী ও ঢালাইলোহা—বিজ্ঞানবিপ্লবের সময় কারিগরী কলা-কৌশলের এগুলি হল সন্দেহাতীত প্রমাণ।

ষোড়শ শতকে সামাজিকভাবে চিকিৎসকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও প্রায়শঃ উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকরা অনেকেই হয়ে ওঠেন তৎকালে প্রচলিত মানবতাবাদের অংশীদার। এই শতকের শেষভাগ থেকে গণিত-গবেষণার প্রবণতা দেখা দেয় যার প্রতি সামাজিক স্বীকৃতি ও সহায়তা ছিল। গণিতবিদরা প্রায়ই বাস্তব রাজনীতি ও দৈনন্দিন ঘটনাচক্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতেন। মুখ ফেরাতেন তথাকথিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। ক্রমে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, সমাজ ব্যবহারিক প্রাপ্তি চাইতে লাগল। এবং অনেক সময়ে অকারণেও। তখন অধিযন্ত্রবাদী ধারণার প্রসার ঘটল। অর্থাৎ অধিযন্ত্রবাদের বিকাশ ছিল একটা সামাজিক প্রয়োজন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন। মজা এই যে, অধিযন্ত্রবাদীরা বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখতেন বলে সমাজের সাথে অনেক সময় তাঁদের ধারণা ও স্বার্থের সংঘাত ঘটত। পরে তাঁরা রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষকতা পেতে উভয়পক্ষ এই সংঘাতকে সহযোগিতায় পরিণত করার

প্রয়াস পেল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু ইটালি থেকে এই সময় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের পটভূমিতে সরে এল। সতেরো শতকে যন্ত্রবাদের বিজয় প্রধানতঃ এই তিন দেশের অবদান।

প্রভাবগতভাবে, বিজ্ঞানবিপ্লব ছিল গ্রীক ঐতিহ্যের প্রাধান্যকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আবিষ্কার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা। প্রকৃতির প্রতিটি অনুষঙ্গে গাণিতিক মডেল ও প্রাযুক্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এর দুটো ক্ষতিকর দিক ছিল। প্রথমতঃ, মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ফল লাভে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়তঃ, যে সব বিষয় গণিতের ছকে ফেলা যেত না হয় তাতে গণিতকে প্রয়োগ করতে গিয়ে উদ্ভট ফল হত বা ওই সব বিষয়কে অনুশীলনের বাইরে রেখে দেওয়া হত। বিষয়গত ও প্রয়োগঘটিত ছাড়া বিজ্ঞানের আর এক দিক ছিল যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিজ্ঞানবিপ্লবের সেরা বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই দর্শন ও ধর্মগত দৃষ্টিভংগিতে ছিলেন খুব গোঁড়া ও অস্বচ্ছ। কিছু কিছু প্রশ্ন ও সমস্যাকে ধর্মের নিজস্ব ভূমি বলে ধরে নিয়ে সেখানে অনুপ্রবেশ না করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। যে শুচিবায়ুতা ডারউইন না আসা পর্যন্ত কাটে নি। নিউটনের একক সাফল্য একদিকে সাধারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন আর কিছু আবিষ্কার করার নেই—হয় এই নিরুৎসাহ প্রবণতার জন্ম দিয়েছে নয়তো যেসব শাখা নিয়ে তিনি কাজ করেন নি শুধুমাত্র সেগুলির গবেষণায় আগ্রহ জাগিয়েছে ; অন্য দিকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস তাঁর বিজ্ঞানে যে সীমাবদ্ধতা এনেছে তার সংশোধন অসম্ভব ও দুঃসাহসিক—এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছে। মূলতঃ তাঁর বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে জন লক বিজ্ঞান ও নীতি-ভিত্তিক এক দর্শন উপস্থাপিত করেন যাতে ব্যক্তির গুরুত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মৌলিক মর্যাদা দেওয়া হয়। এই দর্শন কালক্রমে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় ততখানি সাহায্য করে মার্কসের দর্শন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যতটা করেছে। লকের দর্শনে বিমূর্ত অনুমান নয়, ফলপ্রদ জ্ঞানের ভূমিকা মুখ্য। এইভাবে বিজ্ঞান-বিপ্লব বৈজ্ঞানিক গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে মনন ও সমাজের বিভিন্ন

বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব, তিন শাখায় যথেষ্ট অগ্রগতি এল। যন্ত্র-ও-বাস্তু-ইনজিনিয়ারিং, ভূপদার্থবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা, উদ্ভিদাশ্ম-বিদ্যা—সমৃদ্ধি ঘটল এখানেও। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করায় সৌর বর্ণালীতে কৃষ্ণচ্ছটার আবিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সম্ভব হল। জলচালিত দ্রুতগতির টারবাইন বা বায়ুচালিত পিষ্টন ওই পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যান্য উদাহরণ।

এই সার্বিক আলোকন এক এক দেশে শুরু হয়েছে এক এক সময়ে। ইংল্যাণ্ডে তা সতেরো শতকের শেষ ভাগেই শুরু হয়ে যায়। আর রাশিয়ায় ১৭৬৩ খৃ.-র আগে তার সূচনা হয় নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিজ্ঞানের উন্নতিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল এশিয়ার। উনিশ ও কুড়ি শতকে হবে আমেরিকা ও রাশিয়ার। আঠারো শতকটি কিন্তু পুরোপুরিই ছিল ইউরোপের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিম ইউরোপের।

অনুসন্ধান / বিশ্লেষণের যুগ

এই শতাব্দী বিজ্ঞানীদের করে তুলছিল অনেকটা উদারপন্থী।[১৯] বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের পার্থিব ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা যায় এই বিশ্বাস তখন ক্রমশঃ দানা বাঁধছে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ছিল এক অন্যতম উপাদান। উদারনীতি ভূতত্ত্বকে বাইবেলের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিবরণী থেকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে টেনে আনল, শ্রেণীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় জীববিদ্যাকে নিয়মানুগ করা হল, উদ্ভিদ ও জীবের শারীরবৃত্তির চর্চা শুরু হল, জনন ও অভিব্যক্তির আলোচনায় সাহস ও বলিষ্ঠতা দেখা দিল। সর্বত্রই অনুসন্ধিৎসা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। প্রকাশিত সত্যে আর নয়, চেতনার অনুসন্ধান হচ্ছিল যুক্তি ও বিচারে। সব মিলিয়ে সমাজচিত্র বদলে গেছিল। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ রোপণ, নতুন খাদ্য ও মশলার প্রচলন, রাসায়নিক ও দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য নতুনতর

সামগ্রীর প্রাধান্য—সব নিয়ে মানুষের আচার আচরণ অভ্যাস পালটে যাচ্ছিল। রসিকতা রুচিশীলতা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য আরও বেশি করে সময় ব্যয় করছিল মানুষ। স্থাপত্য নগরপরিকল্পনা গৃহসজ্জা বস্ত্রসজ্জা সবখানেই স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে উঠল প্রধান বিচার্য। সোনা ও মার্বেল পাথরের ব্যবহার কমল, গরু ও ভেড়ার মাংস খাওয়ার অভ্যাস এল, পথঘাট আলোকিত, ফুটপাথ নির্মিত ও বহু বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হল। দৈনন্দিন অনুষঙ্গ থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সংগৃহীত হল, যেমন, বায়ু চলাচল ভালো হলে আগুন ভালো জ্বলে, বা তাপমাত্রা বাড়লে খরা বাড়ে; তেমনি, ফায়ারপ্লেসের প্রচলন ক্যালরিমিতি, বায়ুস্থিতিবিদ্যা, গ্যাসের গতিকতত্ত্বকে ত্বরান্বিত করল, দহনক্রিয়া বাতাস ও জলকে বিশ্লিষ্ট করে উপাদানে বিভক্ত করে দেখাল, বা সংগীতের আগ্রহ নিয়ে এল তারের কম্পন সংক্রান্ত মাত্রিক সূত্রাবলী। উপযোগ থেকে অনুসন্ধান থেকে বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানের লক্ষ্যপথটি তখন ছিল এই।

রসায়নে আঠারো শতকের বিপ্লব

এতদিন রসায়নবিদদের নিচু চোখে দেখা হত কেননা তাঁর কাজ বেশিটাই হাতে কলমে ও অনেকটা নোংরা। এখন তাঁর গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির সুযোগ সুবিধা বাড়ল, এই বিদ্যার চর্চায় বৃত্তিলাভ সহজ হল। অর্থাৎ রসায়নে অগ্রগতি দেখা দিল। ক্ষারীয় লবণের পৃথকীকরণ, ক্ষারীয় ভূমির চিহ্নিতকরণ, নতুন নতুন ধাতু ধাতুকল্প ও ধাতব লবণের আবিষ্কার সম্ভব হল। কার্বনের সাথে সোডিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করে সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করা এবং সোডা ও পটাশকে আলাদা করা গেল। কৃত্রিমভাবে দস্তা উৎপাদন, শিল্পে প্ল্যাটিনামের ব্যবহার, আর ফসফোরাস ও বোরিক অ্যাসিডের আবিষ্কারের ফলে অসাধারণ উন্নতি ঘটল। ল্যাভয়েসিয়র প্রথম অনুমান করলেন যে ক্ষারীয় ভূমিগুলি যৌগ পদার্থ হতে পারে। তিনি (১৭৪৩—১৭৯৪)

বাতাস মৌলিক পদার্থ নয় এই সিদ্ধান্ত থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে আমূল সংস্কার আনলেন। তখন রাসায়নিক যৌগের অনুশীলনের পাশাপাশি সদ্য আবিষ্কৃত বিভিন্ন গ্যাসের অনুশীলন শুরু হল। কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনকে চিহ্নিত করা ও নাইট্রোজেনকে পৃথক করা গেল। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে সংযুক্ত করে জল এল, ব্যাখ্যা করা হল অক্সিজেনের বিভিন্ন ধর্মকে।

রসায়নের এই সামগ্রিক অগ্রগতিতে ল্যাভয়েসিয়র ছাড়া আর যিনি দায়ী তিনি প্রিস্ট্‌লে (১৭৩৩-১৮০৪)। মেয়ো, হেলস, ব্ল্যাক ও ক্যাভেন্‌ডিশের গবেষণার মধ্য দিয়েও রসায়ন উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ল্যাভয়েসিয়রের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গ্যাসের আচরণ সংক্রান্ত তত্ত্বই রসায়নে আধুনিক ও চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটাল। আর সেই সঙ্গে হারাল আদিম বিজ্ঞানের আর এক প্রাচীন ধারণা। যন্ত্রবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার তুলনায় রসায়নে এই রূপান্তর এল অনেক দেরীতে কেননা রসায়নের পরীক্ষামূলক সমস্যাগুলির সমাধান ছিল সময়সাপেক্ষ ও অন্য কিছু ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল। এখানে রাশিয়ার রসায়নবিদ Lomonosov-এর নামোল্লেখ দরকারি মনে করি। পদার্থের পারমাণবিক সংগঠন ও অণুর চলশক্তির মতো বিপ্লবাত্মক ধারণার তিনি উপস্থাপক, শুধুমাত্র রাশিয়ান ভাষায় লিখেছিলেন বলে যাদের কথা, দুর্ভাগ্য, অনেক পরে জানা যায়। রসায়নের পরবর্তী আলোচনার জন্য আমাদের যেতে হবে পরের, বিজ্ঞানের বিষয়গত ইতিহাসের পরিচ্ছেদে।

ইউরোপের বাইরে সমসাময়িক বিজ্ঞানচর্চা

প্রাচ্যে ঃ প্রাচ্যদেশের স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সমসাময়িক বিজ্ঞান (পরিমাণে ও গভীরতায়) আলাদা কোন ঘরাণা তৈরি করতে না পারলেও, এর কিছু কিছু অবদান কৃতিত্বপূর্ণ। চীনদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের পদার্পণ হয়েছিল জেস্যুইট মিশনারীদের চেষ্টায়। এই ধর্মযাজকরা

প্রথমে তাদের পার্থিব সমৃদ্ধি তুলে ধরত এবং তারপর এই ধর্ম-নিরপেক্ষ মননগত উৎকর্ষের ছবি সামনে রেখে ধর্ম পরিবর্তনের কাজে হাত দিত। চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে লেখা তাঁর বিশাল গ্রন্থে জোসেফ নীডহ্যাম মিশনারীদের সহযোগিতার বাইরে ও তার ঢের আগে থেকে চীনের বৈজ্ঞানিক উন্নতির বহু প্রমাণ ও উদাহরণ রেখেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, এই কাজে লাগাবার যন্ত্রপাতি তৈরি, যান্ত্রিক ঘড়ি ও অন্য ধরনের যন্ত্রাদি, ৩৪০ খৃ. থেকে শকটচালিত কারখানার প্রচলন (ইউরোপে যার প্রচলন ১৫৮০ খৃ. নাগাদ), পশ্চিমী বিজ্ঞানগ্রন্থের কিছু কিছু অনুবাদ, চীনা ভাষায় রচিত একাধিক কোষগ্রন্থের প্রকাশ, ভৌগলিক বিষয়ে রচনা ইত্যাদি ওই দেশে তৎকালীন বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ। যেমন বিজ্ঞানী হিশেবে তাই চেন বা উ চেং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তবু সব মিলিয়ে এই বিজ্ঞান যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও আধুনিক ছিল না। তার কারণ তখন চীনের সমাজ-বিকাশের গতি ছিল মন্থর ও দর্শন ছিল অতীতমুখী। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ও দর্শনের প্রভাব থেকে ছাড়িয়ে এনে, বিজ্ঞানকে স্থিতি দিতে পারে নি।

চীনের ছায়ায় ছায়ায় বেড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের জাপান। তার বিজ্ঞান ছিল চীনা বিজ্ঞানের একটা শাখা। সতেরো শতক থেকে জাপানী বিজ্ঞান নিজস্বতা পেতে শুরু করে। পরে জেস্যুইটদের আগমনের ফলে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হয় ও বৈজ্ঞানিক উৎসাহে জোয়ার আসে। জ্যামিতিক বিশ্লেষণ, ইনডিটারমিনেট সমীকরণ, সমাকলন নিয়ে চর্চা শুরু হয়। গণিতবিদদের মধ্যে Ammei, Kohan, Ajima, Kenko ; চিকিৎসাবিদ হিশেবে Ginetsu, Mayeno, Seishu আর বহু শাখায় আগ্রহী Nagahidi উল্লেখযোগ্য। ভূগোল ও উদ্ভিদবিজ্ঞানেও উন্নতি হল।

ক্রমে জেস্যুইটদের প্রতি ঘৃণার দরুণ সাধারণভাবে বিজ্ঞানচর্চার প্রতিই সরকারী বিরোধিতা এল। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অনুশীলন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। বিজ্ঞান তখন যে পক্ষ সামাজিক

ও রাজনৈতিক প্রগতিতে বিশ্বাসী তাদের মুখপত্র হয়ে উঠল, রাষ্ট্রের প্রথাগত গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী।

ভারতবর্ষে : ভারতবর্ষ ও ভারত-প্রভাবিত এলাকায় এই সময়ে, মূলতঃ, সনাতনী চিন্তার প্রাধান্য। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পর থেকে দেশের সমাজচিত্রের সাধারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে আল বেরুনি লিখেছেন, দেশে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ ও অভাব অনটন চিকিৎসকদের স্ববৃত্তি পরিত্যাগে বাধ্য করল। মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে চিকিৎসকরাও রোগীর মল-মূত্র-রক্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ঘৃণা বোধ করতে লাগল। বৌদ্ধবাদ শবব্যবচ্ছেদের বিরোধিতা করল। ফলে শল্যচিকিৎসা নাপিতদের আর প্রসূতিবিদ্যা শূদ্রা-ধাত্রীদের বৃত্তি হয়ে দাঁড়াল। নানারকম ধর্মীয় কুসংস্কার, বাধা নিষেধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রাজা আমলা ও জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকল। ক্রমে মুসলমান রাজত্বে নৃপতি ও জনগণের আলস্য ও নিরুৎসাহ শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সব কিছুকেই গ্রাস করে নিল।[২০]

এরই মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের খণ্ড খণ্ড অগ্রগতি হচ্ছিল। ভাস্করাচার্যের চার অধ্যায়ে বিভক্ত, জ্যোতিষ ও গণিতের মহাগ্রন্থ সিদ্ধান্তশিরোমণি (১১৫০) প্রকাশিত হল। এর প্রথম অধ্যায়ে, লীলাবতীতে, পাটিগণিত ও পরিমিতির; দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগণিতে, সমীকরণের তত্ত্বের; তৃতীয় ও গণিতাধ্যায়ে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের আর চতুর্থ ও গোল-ধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণ, চন্দ্রের দ্রাঘিমা ও পৃথিবীর গোলত্বের আলোচনা আছে। এতে অন্তর কলন ও সমাকলন বিষয়ে কল্পনা আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। বহু ভাষায় অনুবাদিত এ গ্রন্থ মধ্যযুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান। ১৫ থেকে ১৮ শতক অবধি ভারতের জ্যোতিষ সাধারণভাবে সূর্যসিদ্ধান্তের বরাহমিহির-কৃত সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছিল। যেমন মকরাগু (১৪৭৮), নৃসিংহের মকরাগুবিবরণ, গ্রহলাঘব (১৫২০), গণেশ-দৈবজ্ঞের তিথিচিন্তামণি। আরবদের কাছ থেকে নেওয়া তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল সিদ্ধান্তবিবেক-এ (১৬৫৮)। গ্রীকরা জ্যোতিষে রাশি-

চক্রের প্রবর্তনের অনেক আগে থেকেই অবশ্য ভারতে নক্ষত্রগণনার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগে বিভিন্ন নগরে মানমন্দিরও স্থাপিত হল। ১৮ শতকের গোড়ায় সোয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহ জ্যোতিষের বহু তথ্য একত্র করলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ধ্রুপদী কোন সৃষ্টি না হলেও সম্পাদনা সঙ্কলন ও রূপান্তরণের অনেক উদাহরণ পাওয়া গেল। এগুলি ছিল প্রধানতঃ সংস্কৃত, আরবীয় ও ফার্সীভাষায় লিখিত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দিল্লীর মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভ, ধাতুবিদ্যা উদ্যানপালন পশুপালন ও জীববিদ্যার চর্চা, পক্ষীবিষয়ক অঙ্কন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৬ শতকের শিরাজি-কৃত প্রাযুক্তিক সাফল্যের—শকটচালিত কারখানা, বহনযোগ্য আর বহুনলা কামান, চলমান স্নানাগার, এলাহি বর্ষপঞ্জির উদ্ভাবন—উল্লেখ করা দরকার। মোটের ওপর, ভারতীয়দের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণশক্তি আর দক্ষতায় টান পড়েনি। কিন্তু সমস্ত প্রয়াসই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সামাজিক সহযোগিতা ছিল না। রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠ-পোষকতা ছিল বিরল। ব্যক্তিপ্রয়াসকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বা সংঘবদ্ধ করা যায়নি। সংগঠনের অভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান এই সময়ে পূর্ণ-বিকাশের সুযোগ পেল না। এর ক্ষতিপূরণ তিব্বতের বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিজ্ঞানকে সে প্রভাবিত করছিল এই প্রাপ্তিতে মেলে না।

ঔপনিবেশিক আমেরিকায়ঃ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে প্রথমে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার পরে উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদকে পরীক্ষা করা ও কাজে লাগানো শুরু হল। লোকবসতি আরম্ভ হল। স্থাপিত হল স্পেন পর্তুগাল ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স নানা দেশের উপনিবেশ। উপনিবেশগুলিতে জীবনধারা সমাজবিন্যাস ইত্যাদির বিস্তর পার্থক্য ছিল। ১৭ শতকের শেষভাগ থেকে মোটামুটি একটা সমতা এল। এর মধ্যে মেকসিকোয় বিজ্ঞানের ভালো চর্চা ছিল। মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন (১৪৫১), ছাপার কাজ (১৫৩৯) তার প্রমাণ। ১৮ শতকের শেষাশেষি পাঠ্যসূচীতে অন্তরকলন অন্তর্ভুক্ত হল, প্রতিষেধক টীকা ব্যাপক প্রচলন পেল। তখনকার এই তৃতীয় বিশ্বের উল্লেখ্য অগ্রগতি

হয়েছিল খনিজবিদ্যায়। Cardenas ও Barba ছিলেন এ বিষয়ে সবচেয়ে কৃতী। রসায়নেও আগ্রহ দেখা গেল। তৃতীয় বিশ্ব থেকে সিঙ্কোনা কোকো তামাক রবার টমেটো আলু ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করল। ইউরোপ থেকে বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীরা এসে দীর্ঘ ও বিস্তৃত অভিযান করে এখানকার পরিবেশ ভূগোল উদ্ভিদ খনিজবিদ্যা নিয়ে বই লিখলেন। ব্রেজিল কানাডা বা ব্রিটিশ শাসিত উত্তর আমেরিকায় বিজ্ঞানের মান ও ধরন তখন প্রায় এক রকমই ছিল।

উত্তর আমেরিকার বিজ্ঞানে ও-দেশের প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে ব্রিটিশ হ্যারিয়টের গ্রন্থ, উদ্ভিদের শারীর সংস্থান ও যৌনপ্রসঙ্গ নিয়ে মেদার ও লোগানের গবেষণা, মিচেলের ভৌগলিক মানচিত্র প্রধান। আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের (১৭০৬-৯০) বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা তো স্বনামধন্য। তড়িৎ-আধানের সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁর এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার এক অন্যতম স্তম্ভ। তাঁর ওই বিষয়ের গ্রন্থটি পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সবচেয়ে প্রচলিত গ্রন্থ ছিল। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির তুলনায় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় দর্শন ও ধর্মীয় বিবেচনার ভূমিকা অনেক কম ছিল, ফলে বিজ্ঞানের পক্ষে পরিবেশ সেখানে ছিল অনেক অনুকূল।

বিজ্ঞানের বিষয়গত অগ্রগতি ও ইতিহাস

গণিত

সঠিকভাবে দেখলে গণিত শুধু যে চরম সত্যকে তুলে ধরে তা না, তুলে ধরে পরম সুন্দরকেও। মহোত্তম শিল্প যেমন, গণিত তেমনি কঠোর নিখুঁত। মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারার চেতনা কবিতার মতো গণিতেও রয়েছে। মন্তব্যটি বারট্রণ্ড রাসেলের। এ ছাড়া গণিতের আছে বিশুদ্ধ ও যুক্তিবাদী বিচারক্ষমতা। গণিতের সম্ভাবনা ও প্রভাব তাই দূরপ্রসারী।

ত্রিকোণমিতি ঃ ত্রিকোণমিতির উদ্ভব ও প্রসারের কথা এর আগের পরিচ্ছেদ দুটিতে কিছু কিছু বলেছি। বিকাশের উন্নত পর্যায়ে এসে ত্রিকোণমিতি বীজগণিতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগল। যেমন ভিয়েটা (১৫৪০-১৬০৩) দুটি শাখা নিয়ে পাশাপাশি কাজ করছিলেন। তাঁর বলয়ের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতির প্রয়োগ তাঁর বীজগাণিতিক অঙ্কপাতনকে সাহায্য করল। গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আধুনিক ধারণার প্রবর্তনে তিনি উভয় শাখা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। সমন্বয়ের এই প্রয়াসটি Diophantos-এর প্রভাব, যা Bombelli থেকে ভিয়েটা পর্যন্ত অনেককে প্রভাবিত করেছে। যেমন লগারিদম। এর সূচনা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ত্রিকোণমিতিক গণনা থেকে। এর আবিষ্কর্তা Napier তাঁর লগবিষয়ক পদ্ধতিকে[২১] সাইন-চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করেন। ক্রমে জ্যামিতির ওপর নির্ভরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ত্রিকোণমিতি হয়ে উঠল অপেক্ষক (ফাংশন) সংক্রান্ত তত্ত্বের সমাহার, বিশেষত, সূচক ও লগবিষয়ক ফাংশনের।

বীজগণিত ঃ সপ্তদশ শতকের শুরুতে দেকার্তে ভিয়েটা ও হ্যারিয়টের প্রচেষ্টায় হ্রস্বীকৃত বীজগণিতের প্রতীকী বীজগণিতে রূপান্তর সম্পূর্ণ

হয়েছে। এই শতকের প্রথম যুগান্তকারী কাজ ছিল ভিয়েটার লজিস্টিক বিষয়ে গবেষণা, যার ফলশ্রুতি—বীজগাণিতিক সমীকরণ-তত্ত্ব ও বিশ্লেষণী জ্যামিতির সূচনা। আর এই শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ কলনপদ্ধতির, অন্তরকলন ও সমাকলন উভয়েরই, ব্যাপক বিস্তার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বীজগাণিতিক অপেক্ষকের চরম ও অবম সীমা নির্ণয়ের জন্য Fermat-এর পদ্ধতি; সাধারণ অধিবৃত্ত $y^p = ax^n$ ও তারপর $y^p a^m = b^p x^m$ ও তারপর সাধারণ পরাবৃত্ত $x^n y^p = a^n b^p$-র বর্গ-করণ; Cavalieri-র প্রমাণ (আধুনিক অঙ্কলিপি অনুসারে) $\int_0^a x^m dx = \frac{1}{m+1} a^{m+1}$; Roberval এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় ও ট্যানজেণ্টে-র গণনা এই দুটির মধ্যে মৌলিক সম্পর্কের আবিষ্কার; ট্যানজেণ্ট সমস্যার ব্যস্তভেদ; অভিসারী শ্রেণীর প্রবর্তন এবং সাইক্লয়েড রেখা নিয়ে গবেষণা। এরপর এল নিউটনের কলন-গণনা যে $A^m B^n C^p$-র fluxion হল $maA^{m-1} B^n C^p + nbA^m B^{n-1} + pcA^m B^n C^{p-1}$ যখন a, b, c হচ্ছে যথাক্রমে A, B, C-র fluxion এবং m, n, p হচ্ছে যে কোন ভগ্নাঙ্ক বা পূর্ণসংখ্যা। এই বিষয়ে লাইবনিৎসের গবেষণা ও সাফল্য এবং নিউটন ও তাঁর কলনপদ্ধতিকে জ্যামিতিক মডেল থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে একে স্বনির্ভর করার প্রয়াসকে উল্লেখ করতে হবে। এইভাবে সতেরো শতকেই প্রতীকী বীজগণিত থেকে কলন-প্রণালীতে উত্তরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা যায়।[২২] Euler, Monge, d' Alembert, Lagrange, Laplace প্রমুখের হাত দিয়ে এর আরও প্রসার ও প্রয়োগ ঘটল অষ্টাদশ শতকে। সম্পূর্ণ বিভেদক সমীকরণ নিয়ে ব্যাপক অনুশীলন হল। এল টেলারের প্রসারণ-শ্রেণী $f(x+h) = f(x) + h f^1(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) + \cdots$। Riccati-র $y' = f(x) + yg(x) + y^2 h(x)$ সমীকরণের সমাধান। লিমিট বিষয়ক তত্ত্ব। আংশিক বিভেদক সমীকরণ প্রচলিত হল। ল্যাপল্যাস ফাংশন V গণনা করে

$\frac{d^2V}{dx^2}+\frac{d^2V}{dy^2}+\frac{d^2V}{dz^2}=0$ সমীকরণের সমাধান করলেন। n ঘাতের কোন সমীকরণের যে অবশ্যই n সংখ্যক বীজ থাকবে তা অনুমান করা গেল ও n-এর যে কোন মৌলিক সংখ্যার জন্য $x^n-1=0$ সমীকরণের সমাধান করে দেখালেন Gauss. নির্ধারক ও উচ্চতর ঘাতের সমীকরণ নিয়েও এই সময়ে চর্চা হয়েছিল, অমূলদ রাশির গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় ত্রিকোণমিতিক, সূচক ও লগবিষয়ক অপেক্ষকের সঙ্গে একে সম্পর্কান্বিত করা হচ্ছিল। শ্রেণীর পাশাপাশি অসীম গুণন ও পুনরাবৃত্ত ভগ্নাঙ্কেরও অধ্যয়ন শুরু হল। বিভিন্ন ধরনের বিভেদক সমীকরণের জ্যামিতিক অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন Monge. উনিশ শতকে এসে বীজগণিতের গবেষণার ধরন কিছুটা পাল্টে গেল। কাজ হল সমবায় / বিন্যাস নিয়ে, যা বিমূর্ত গঠন, সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করল। ছক ও নির্ধারক, ধাত্র বা ম্যাট্রিক্সের প্রবর্তন, প্রকার ও অভেদ, কোয়াটারনিয়ন ও অতি জটিল রাশি—বিবিধ নতুন প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে রৈখিক বীজগণিতের প্রচলন হল। যদিও Galois প্রমুখ কেউ কেউ সমীকরণ সম্পর্কে কাজ করছিলেন তবু এই শতকে সমীকরণের ওপর থেকে মনোযোগ সরে এসেছিল বীজগাণিতিক গঠনপ্রণালীর ওপর যা বিংশ শতাব্দীতে হয়ে উঠল বীজগণিতের প্রধান আলোচ্য বিষয়। উনিশ শতকে ভেক্টর বিশ্লেষণের উদ্ভব হল Grassmann ও Riemann-এর হাত দিয়ে আর বলবিদ্যায় তা প্রযুক্ত হল ব্যাপক ভাবে। ফলে এর মূল অগ্রগতির জন্য দায়ী পদার্থবিজ্ঞানীরা। নির্ভরযোগ্য অঙ্কলিপির উদ্ভব, প্রয়োগের বিস্তৃতি, ও পরিপূরক আর একটি শাখা টেনসর বিশ্লেষণের প্রচলনের ফলে এর মূল প্রসার ঘটে বিশ শতকে। মূল তত্ত্ব সমূহ রচিত হয় (এ প্রসঙ্গে Voigt উল্লেখ্য), বিভিন্ন শাখায় এদের ব্যবহার ঘটে (যেমন বিভেদক জ্যামিতি)।

জ্যামিতি ঃ আগেই বলেছি, ভিয়েটার (এবং Fermat ও দেকার্তের) প্রচেষ্টায় বিশ্লেষণী জ্যামিতির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু

সার্বিক উন্নতির জন্য জ্যামিতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে Monge (১৭৪৬-১৮১৮)-এর জন্য। ইউক্লিডের সমান্তরাল স্বতঃসিদ্ধের কার্যকরিতা পরীক্ষা করে দেখা, অবস্থানানুপাত প্রণালীর বিশ্লেষণ, বর্ণনাত্মক জ্যামিতির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ ও বিভেদক জ্যামিতিতে প্রয়োগ, বিশ্লেষণী জ্যামিতিকে আধুনিক রূপ দেওয়া —সমস্তই Monge-এর কৃতিত্ব। স্থানরেখার বিভিন্ন সাধারণ ধর্মের বিস্তৃত সমীক্ষা; একমাত্রিক, বিকাশক্ষম দ্বিমাত্রিক (বিভেদক সমীকরণ $rt - s^2 = o$র সাহায্যে) ও ত্রিমাত্রিক পৃষ্ঠের বিস্তৃত বিশ্লেষণ তাঁকে বিভেদক জ্যামিতির ক্রমবিকাশেও অংশীদার করেছিল। সরলরেখা, বক্ররেখা, তল ও ত্রিমাত্রিক সমস্যার সুসম্বদ্ধ অনুশীলনের ফলে বিশ্লেষণী জ্যামিতি, জ্যামিতিতে বীজগণিতের প্রয়োগ ছাড়িয়ে, স্বনির্ভরতা পেল। বিভিন্ন তলরেখাকে ক্রম অনুসারে শ্রেণী-বিভাজিত করা গেল। স্থানাঙ্ক ও স্থানাঙ্ক পরিবর্তন বা ভেদ সম্পর্কে অনুশীলন করা হল। জ্যামিতি ক্রমেই প্রাপ্ত-মনস্ক হয়ে উঠছিল। ওদিকে বিশুদ্ধ জ্যামিতি অভিক্ষেপ-বিষয়ক জ্যামিতিতে Desargues-এর অবদানের পর অনেক দিন নতুন আর কোন চর্চা ও উন্নতির মুখ দেখে নি। উনিশ শতকে Poncelet-এর হাত দিয়ে এর নবজীবন ঘটল। অভিক্ষেপ জ্যামিতি হল ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম ও অনুষঙ্গের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ। এতে Chasles ও Steiner-এর অবদান প্রধান। পরে Staudt-এর মাধ্যমে জ্যামিতির এই শাখা মাত্রাগত ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে, হয়ে ওঠে অবস্থানগত স্বাধীন ও স্বনির্ভর জ্যামিতি। এর পর Gauss, Lobachevski ও Bolyai-এর প্রচেষ্টায় পরাবৃত্ত-জ্যামিতির জন্ম হয় ও জ্যামিতির ধ্রুপদী ধারণায় তা বিপ্লব নিয়ে আসে। Klein যেমন জ্যামিতির এক সামগ্রিক সাংগঠনিক সংশ্লেষণে হাত দেন। হিলবার্ট জ্যামিতিকে নতুন করে গড়ে নেন এইভাবে যে, জ্যামিতিতে আছে তিনটি বিমূর্ততা—বিন্দু রেখা ও তল—যা কিছু কিছু নিয়ম ও সম্পর্ক মেনে চলে যাদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত একুশটি স্বতঃসিদ্ধে ভাগ করে নেওয়া যায়। সমস্ত জ্যামিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এরা।

ফলে জ্যামিতিকে তিনি যুক্তিবিদ্যা ও পাটিগণিতের অনুশাসন ছাড়া আর সব কিছুর বাঁধন থেকে মুক্তি দেন। আবার এরই পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও বিশ্লেষণী জ্যামিতি আর রৈখিক ও সাধারণ বীজগণিত সমন্বিত হয়ে জন্ম নেয় বীজগাণিতিক-জ্যামিতি। n মাত্রিক তলের উত্থাপন করে ঐ তলের স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যা অধ্যয়ন করা হয়। Unicursal রেখা (এমন এক বীজগাণিতিক রেখা, ঘাত n হলে যার সুসঙ্গত যৌথবিন্দুর সর্বোচ্চ সংখ্যা $N=\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ হবে), দ্বিমূলদ রূপান্তর ইত্যাদি ছিল বীজগাণিতিক জ্যামিতির প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ। বিশ্লেষণী প্রণালী ও জ্যামিতিক প্রণালীর মধ্যে যোগসূত্র নিবিড় হল। Gauss পৃষ্ঠভূমির বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবহার করে অণু-জ্যামিতিকে সমৃদ্ধ করলেন, ভূপদার্থবিদ্যক অনুষঙ্গে জ্যামিতির প্রয়োগ ঘটল। Riemann ও Lie-এর মাধ্যমে অণু-জ্যামিতি বিভেদক জ্যামিতির জন্য উন্নত ক্ষেত্র তৈরি করে বিংশ শতকে তার চরম সমৃদ্ধি এনে দিল। গণিত হয়ে উঠল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের ডান হাত।

সংখ্যাতত্ত্ব : যে Diophantos-এর কথা আগে বলেছি তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে Fermat সংখ্যাতত্ত্বের সুনির্দিষ্ট রূপ দেন। গড়ে তোলেন বিভিন্ন প্রণালী—অসীম অবরোহণ পদ্ধতি যেমন; মৌলিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন অনুমান; সংখ্যা বিষয়ে একাধিক সূত্র—যেমন $c^p=\frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!}$; ও $x^n+y^n=z^n$, $(n>2)$ সমীকরণের কোন মূলদ সমাধান নেই অথবা $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণের পূর্ণসংখ্যক সমাধান আছে—এই রকম একাধিক উপপাদ্য। সম্ভাবনা তত্ত্বকে প্রথমে সমবায়/বিন্যাসের অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্বের উপাদান হিশেবে ধরা হয়েছিল, এর ওপর প্রথম গবেষণা হিউজেনসের। ইনডিটারমিনেট সমীকরণ, দ্বিঘাত অবশেষ তত্ত্ব, দ্বিঘাত আঙ্গিক ইত্যাদির ব্যাপক অনুশীলনে এই শাখার সমৃদ্ধি

ঘটল। Kummer বীজগাণিতিক সংখ্যার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে সংখ্যাতত্ত্ব ও বীজগণিতের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক স্পষ্ট হল, সংখ্যা ও পূর্ণসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন আঙ্কিক সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান হল। ল্যাটিন বর্গ ও গ্রীকো-ল্যাটিন বর্গের গুরুত্ব অনুভূত হল যা পরবর্তীকালে পরিসংখ্যানে নতুন যুগ এনে দেবে।

পরিসংখ্যান: সম্ভাবনা ভিত্তিক নানা ধাঁধার সমাধান আর জুয়াখেলার ফলাফলের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ থেকে সম্ভাবনাতত্ত্বের আদিরূপ উঠে এসেছিল। ক্রমে ঘটনাগত পর্যবেক্ষণ থেকে ঘটনার সম্ভাবনা নির্ধারণ করার সুসম্বদ্ধ গাণিতিক পদ্ধতি এল, অখণ্ড সম্ভাবনা ও মিশ্র সম্ভাবনা বিষয়ে উপপাদ্য রচিত হল, অসীম চলরাশির প্রবর্তন, গুরুত্ব আরোপের পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণগত ত্রুটির বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে গণিতের এই শাখা সমৃদ্ধি পেল। বিবিধ উপপাদ্যের পরিকল্পনা, সম্ভাবনা কেন্দ্রিক বহু ধ্রুপদী সমস্যার সমাধান ও প্রয়োগ, আর জেনারেটিং ফাংশন তত্ত্বের আবিষ্কার করে ল্যাপল্যাস সম্ভাবনা-তত্ত্বে অসামান্য অগ্রগতি এনে দিলেন। তাঁর ও পয়সনের চেষ্টায় এই তত্ত্ব যেমন গাণিতিক উন্নতি পেল; বেয়েস, বুল প্রমুখের অবদানে তেমনি পেল যুক্তিগত সমৃদ্ধি। এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটল ডেমোগ্রাফি ও জীবন বীমা প্রকল্পে। বিশ শতকের আগে পরিসংখ্যানের শ্রেষ্ঠ দুই সাফল্যের এটি ছিল প্রথমটি। দ্বিতীয়টি হল Gauss প্রমুখের ত্রুটি-বিষয়ক-তত্ত্ব, অন্তর্সম্পর্কের ধারণা, একটি পরিবর্তিত হলে অন্যটিও পরিবর্তিত হয় এমন দুটি রাশির গাণিতিক সম্পর্ক, বৃহৎ-সংখ্যা-বিষয়ক-তত্ত্ব, Stochastic অভিসারিতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গ যা পিয়ারসনকে প্রকল্পের পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার অনুশীলনে আগ্রহী করে। প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগত-তথ্যের ভিত্তিতে, বিশেষ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও ধারণাকে ঐ তথ্য সমর্থন করে কিনা তা পদ্ধতিগতভাবে বিচার করে দেখা এই পরীক্ষার কাজ। পদ্ধতিটিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে Gosset-এর অবদান উল্লেখ্য।

পরিসংখ্যান, পাস্কাল ও Fermat যার দুই আদি পুরুষ আর

Quetelet যার আধুনিক রূপকার, তত্ত্বের পাশাপাশি প্রয়োগের দিক থেকেও এগিয়ে যাচ্ছিল। সংখ্যামান ও পদার্থের গতিতত্ত্বের আলোচনায় এর প্রয়োগ ঘটেছিল। Galton কোষবিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম ও দুরূহ অনুসঙ্গে পরিসংখ্যানকে প্রয়োগ করে পরিমাণাত্মক-জীববিদ্যার জন্ম দিলেন। বিবিধ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে পরিসংখ্যান রাজনৈতিক পাটিগণিতের জন্ম দিল যার কথা আগে একবার বলেছি। নতুন নতুন প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রবর্তনের সাথে সাথে এল বিস্তারণ সংক্রান্ত সমস্যা। প্রাক্‌কলনের একটি পর্যাপ্ত প্রণালী উদ্ভাবনের কাজে তিনটি পৃথক পদ্ধতিকে পরীক্ষা করে দেখা হল—জ্যামিতিক পদ্ধতি, গাণিতিক উপপাদন, চারিত্রিক অপেক্ষক। দেখা গেল প্রয়োজনীয় প্রণালীটির অন্ততঃ দুটি শর্ত থাকবে—দক্ষতা ও গরিষ্ঠ সম্ভাব্যতা। এর পর এল পর্যবেক্ষণগত-তথ্যের যোজনা ও পরীক্ষামূলক বিন্যাস যা একত্রে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন (ই. ডি.) নামে পরিচিত হল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে, পরিসংখ্যানের দুটি উদ্দেশ্যের—১. পর্যবেক্ষণগত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক তথ্যে সংক্ষিপ্ত ও উন্নত করে নেওয়া ও ২. ঐ বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিমাণ সর্বোচ্চ করার জন্য পরীক্ষামূলক ও পর্যবেক্ষণগত অনুসন্ধান চালানো—এটি ছিল দ্বিতীয়টি। গ্রীকোল্যাটিন বর্গের ব্যাপক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ই. ডি. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ভাবেই বিকাশের চরম পর্যায়ে এল।[২৩] গাণিতিক বিশ্লেষণের আলোচনায় পরিসংখ্যানের কথা আবার আসবে। তার আগে এখানে ফিশারের নামোল্লেখ জরুরি মনে করি।

গণিতযন্ত্র : গণিতযন্ত্র বলতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত-গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই সব যন্ত্রপাতিকে বোঝাচ্ছি যাতে কারিগরী কলা-কৌশল আধুনিক ইনজিনিয়ারিং যন্ত্রপাতির মতো উন্নত পর্যায়ের নয় কিন্তু বর্তমানের ভারী, সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রের প্রাচীন পূর্বপুরুষ যারা। ওই সব যন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভাবনার ও তখনকার প্রাযুক্তিক দক্ষতার যোগ্য সাক্ষী। যন্ত্রগুলি মূলতঃ জ্যামিতিক-বলবিদ্যক যন্ত্র, যার একটি ছোট

তালিকা প্রকাশযোগ্য হতে পারে—

১. Astrolabe (নক্ষত্রের অবস্থানগত সমস্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য) ২. সূর্য ঘড়ি ৩. কাঁটা ঘড়ি (Ring-dial) ৪. চৌম্বক ঘড়ি (যেখানে সময় নির্দেশ করে একটি কম্পাস) ৫. নৌ চালনার কম্পাস ৬. যন্ত্র ঘড়ি (তার ও ওজন সহ) ৭. যন্ত্র ঘড়ি (স্প্রিং, গিয়ার ও রড সহ) ৮. Celestial ও Terrestrial গ্লোব ৯. Armillary Sphere ১০. Quadrant ১১. Polar-Sighting tube ১২. Equatorium (গ্রহের গতিবিষয়ক সমস্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য)১৩. Orrery (জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল) ১৪. মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রাদি ১৫. জরিপ কাজে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ১৬. নৌপরিবহণে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ১৭. Runic বর্ষপঞ্জী ১৮. Clog almanacs ১৯. গণনযন্ত্র ২০. Sector ২১. Slide rule ২২. যান্ত্রিক খেলনা ও পুতুল ২৩. ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র ২৪. তারামণ্ডল (Volpaia কর্তৃক ১৫ শতকের শেষভাগে নির্মিত) ২৫. System of Fortification ২৬. চশমা ২৭. টেলিস্কোপের প্রাথমিক সংস্করণ ২৮. মাইক্রোস্কোপের প্রাথমিক সংস্করণ ইত্যাদি।

গণিত—যুক্তি ও বিশ্লেষণ : উনিশ শতক বাষ্পশক্তি ও অভিব্যক্তিবাদের মত, বিশুদ্ধ গণিতের আবির্ভাবের জন্যও প্রসিদ্ধ। বিশুদ্ধ গণিত নিয়মানুগ যুক্তিবিদ্যার মত দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সঙ্গত ঘোষণার উপর ভিত্তি করে। যেমন, এই এই রকম একটি প্রোপোজিশন ■ এর ক্ষেত্রে যদি 'কোন একটা জিনিস' সত্য হয় তবে ওই ওই রকম আরেকটি প্রোপোজিশন এর ক্ষেত্রে ওই জিনিস সত্য হবে। অর্থাৎ অনুমিতির বিশেষ কিছু নিয়ম নিয়মানুগ যুক্তিবিদ্যার অধিকাংশ তত্ত্ব গড়ে তুলেছে। যুক্তি-বিদ্যাকে নিয়মানুগ করে, গণিত ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় তৈরির কাজে de Morgan-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খৃ.-এ বুল তাঁর চিন্তা বিষয়ক সূত্রসমূহ-গ্রন্থে বিশুদ্ধ গণিতকে প্রথম স্পষ্ট রূপ দিলেন। প্রতীকী যুক্তিবাদীদের গবেষণা থেকেও বিশুদ্ধ গণিত উপকৃত হল। Frege প্রচলিত চলরাশির পাশাপাশি আনুপাতিক চলরাশির

প্রবর্তন করলেন। তারপর বিশ শতকে Peano, Brouwer হোয়াইটহেড ও রাসেলের প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ গণিত বা গাণিতিক যুক্তি-বিদ্যা তার আধুনিক পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল।

তত্ত্বীয় পরিসংখ্যান, গণিতযুক্তি ও গাণিতিক বিশ্লেষণ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। গাণিতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান Cauchy-র। তাঁর অপেক্ষকের ধারাবাহিকতা-তত্ত্ব, লিমিটের সাহায্যে পূর্ণসংখ্যার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ, ঘাত সংক্রান্ত শ্রেণীর বিশ্লেষণ ও তার অভিসারিতা ও জটিল চলরাশির অপেক্ষক বিষয়ে তত্ত্ব—সমস্তই গণিত বিশ্লেষণকে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিগতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও তিনি প্রমাণ করেন, যদি X এবং Y কোন একটি আবদ্ধ পরিসীমার মধ্যে x ও y-এর সন্তত অপেক্ষক হয়, তবে

$$\int (Xdx+Ydy) = \pm \int\int\left(\frac{\delta X}{\delta y} - \frac{\delta Y}{\delta x}\right)dxdy.$$

মডুলার, এ্যাবেলিয়ান, গামা, এবং উপবৃত্তক-অপেক্ষকের প্রতিটিই, Riemann-এর অপেক্ষক বিষয়ে তত্ত্ব ও Poincare-এর আঙ্গিক সম্পর্কে গবেষণাও গাণিতিক বিশ্লেষণকে উন্নত করেছে। আঙ্গিকের (ফর্ম) পাশাপাশি Cantor সেট সংক্রান্ত ধারণারও প্রচলন করেন। সব নিয়ে গাণিতিক বিশ্লেষণ কতটা ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় মিলবে।

আজ বিজ্ঞানের সঙ্গে গণিতের[২৪] যোগাযোগ অন্ততঃ দুভাবে। প্রথমত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে তার সম্পর্ক ও প্রয়োগের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, মানুষের যুক্তি, চিন্তা ও বুদ্ধির উপর এর প্রভাবের ভিত্তিতে। প্রথমটিকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায়, ১. গণিত ভৌত ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণে বিজ্ঞানকে একটি গাণিতিক প্রতীক নির্ভর নির্দিষ্ট ভাষারীতি প্রদান করেছে। ২. গণিত বিজ্ঞানকে দিয়েছে অজস্র পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ নিয়ামক সূত্র)। ৩. গণিত বিজ্ঞানকে যুক্তিসংগত অনুমান গ্রহণ করার কাজে সাহায্য করেছে। ৪. বিভিন্ন প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করার

জন্য গণিত বিজ্ঞানকে বহু গাণিতিক প্রসঙ্গ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে, যেমন, আপেক্ষিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ, লিমিট প্রসঙ্গ, পরিসংখ্যানগত সূত্র প্রভৃতি। আর দ্বিতীয়টি তো মানুষের চিন্তার ধরন ও চর্চার ধারাকেই আজ আমূল পাল্টে দিয়েছে, দিতে পেরেছে। ফল—আধুনিক বিজ্ঞান, ধারণা ও পদ্ধতি দুভাবেই, আজ হয়ে উঠেছে আরও বেশি গণিতধর্মী।

পদার্থবিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান-নভোপদার্থবিজ্ঞান ঃ কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটনের পরবর্তী যুগে প্রাযুক্তিক কলাকৌশলের ধারাবাহিক উন্নতির ফলে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গাণিতিক বিশ্লেষণের ভূমিকা ক্রমেই বাড়তে থাকায় বিজ্ঞানের এই শাখা আরও বিস্তৃত ও সফিস্টিকেটেড হয়ে উঠে নভোপদার্থবিজ্ঞানের রূপ নিল। নতুন গ্রহ ও বিভিন্ন গ্রহের নতুন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হল, Herschel-এর গবেষণায় ছায়াপথের গঠন সম্পর্কে প্রথম আভাস পাওয়া গেল, নীহারিকাদের ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করা ও তাদের তালিকা তৈরি করা সম্ভব হল। তিনি প্রমাণ করলেন যে বহু ঘনিষ্ঠ তারকাযুগল আসলে ভৌত ভাবে যুগ্মমণ্ডল, ফোটোমিতি প্রণালীতে অনুশীলনের সূচনা হল তাঁর হাতে। উনিশ শতকের মূল্যবান অবদানের মধ্যে ছিল আন্তর্নাক্ষত্রিক দূরত্ব নির্ণয়ে প্রথম সাফল্য, একাধিক নীহারিকার কুণ্ডলিত গঠনাকার আবিষ্কার, সৌর কলঙ্কের সময়ানুবর্তিতা গণনা, বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে মহাজাগতিক বস্তু সমূহের উপাদান ও গঠন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ. সূর্যে হিলিয়ামের অস্তিত্বের আবিষ্কার—যা তখনও পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল, নক্ষত্রের বর্ণালীর শ্রেণী-বিভাজন, বহু ছায়াপথ-নীহারিকার গ্যাসীয় অবস্থা সম্পর্কে ধারণা, নাক্ষত্রিক বর্ণালীকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন নক্ষত্রের লাইন-অফ-সাইট গতিবেগের গণনা প্রভৃতি। কিন্তু তখনও কয়েক হাজার আলোকবর্ষের মধ্যে গণনা ও পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ ছিল।

ফোটোমিতির ব্যাপক ব্যবহার ও বৃহদাকার প্রতিফলনক্ষম-টেলিস্কোপের আবিষ্কারের ফলে বিশ শতকে গবেষণার ক্ষেত্র দ্রুত বৃদ্ধি পেল। আলোকচিত্র গতি, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন সম্বন্ধে তথ্য জোগাল। আরও পরে পর্যবেক্ষণে ফটো-বিদ্যুৎ পদ্ধতির প্রচলন হতে তথ্যের বিশুদ্ধি ও পরিমাণ দুইই বেড়ে গেল। মহাজগতের আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা এর ফলে গেল বদলে। হাজার হাজার নিকটস্থ নক্ষত্রের পৃথিবী থেকে দূরত্ব এখন আমাদের জানা, দূরস্থ বস্তুসমূহের দূরত্ব নির্ণয়ের কাজে বিশেষ এক ধরনের চল-নক্ষত্র Cepheids-এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কুণ্ডলিত নীহারিকারা যে ছায়াপথের বাইরের বস্তু তা প্রমাণিত হয়েছে, ছায়াপথ-মণ্ডলীতে অবস্থিত মোট পদার্থের সামগ্রিক পরিমাণ গণনা করা গেছে। এডিংটন প্রমুখের গবেষণা থেকে নক্ষত্রের গঠনপ্রকৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়ায় নক্ষত্রের ভর ও আলোকপ্রভার তাত্ত্বিক সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে। নক্ষত্রের শক্তির উৎস নিয়ে Bethe প্রমুখ গবেষণা করেছেন। সৌরকলঙ্কের বর্ণালী, সংগঠন ও উজ্জ্বলতা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে (Lyot উল্লেখ্য)। সূর্যের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ও অতিবেগুনী রশ্মি নিয়েও অনেক কিছু জানা গেছে। নভোপদার্থের বিশ্লেষণে আজ নতুনতর পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটছে, নতুন উপশাখা জন্ম নিচ্ছে। সৌরমণ্ডল কী করে বর্তমান রূপ পেয়েছিল আর প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল পৃথিবীতে কীভাবে (আছে কি প্রাণ মহাজগতের আর কোথাও) তার ওপর বহু তত্ত্ব রচিত হয়েছে। প্রতিটি তত্ত্বেই কম বেশি খামতি আছে যা দূর করার প্রয়াস চলবে। শুধু এরই মধ্যে আণবজীববিদ জাক মোনো (নোবল পুরস্কার, ১৯৬৫) আস্তিক ও ধার্মিক সমাজকে এক দার্শনিক আঘাত দিলেন, বললেন, মহাজগতে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে শুধুমাত্র একবার। এই অনাদি অনন্ত অসীম নির্বিকল্প মহাশূন্যে মানুষ একেবারে একা। জীবন হল প্রকৃতির লটারিতে প্রথম হয়ে জেতার মতো এক একক ও বিরলতম ঘটনা, যা পৃথিবীতে ঘটে গেছে, আর কোথাও ঘটে নি, ঘটবে না।

আলোক শক্তি-দৃগবিজ্ঞানঃ আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা উনিশ শতক থেকে দানা বাঁধতে শুরু করে। নিউটনের সমসাময়িক হিউজেনস, প্রথম, আলোকে কণা বা তরঙ্গ হিশেবে উল্লেখ করেন। আলোকতরঙ্গতত্ত্ব বিচ্ছুরণকে কীভাবে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে তা তিনি গণনা করে দেখান। কিন্তু তাঁর ধারণা উনিশ শতকে Young ও Fresnel-এর গবেষণা ও Malus-এর প্রতিফলনের মাধ্যমে সমাবর্তনের আবিষ্কার না হওয়া অবধি প্রতিষ্ঠা পায় নি। ম্যাক্সওয়েলের আলোকের বিদ্যুৎচুম্বকীয় তত্ত্ব এই প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করে, আর Lorentz তাঁর অণুবীক্ষণ-তত্ত্বে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন। এরই পাশাপাশি আলোক-তরঙ্গের যাতায়াতের মাধ্যম হিশেবে মহাশূন্য জুড়ে ইথারের অস্তিত্বের কল্পনা শুরু হয়, ইথার যা দেখা যায় না, ধরা যায় না, যা পরীক্ষার অতীত।

প্রায়োগিক প্রসঙ্গে ফটোমিতির কথা আগেই বলেছি, এখন বর্ণালী বিশ্লেষণের কথা বলব। এই উপলক্ষে বুনসেন-কার্‌চফ সূত্র, সৌর বর্ণালী নিয়ে Fraunhofer-এর গবেষণা ও আলোক তরঙ্গ উৎসের আপাত কম্পাঙ্কের সাথে উৎসের আপেক্ষিক গতির সম্পর্ক নির্ণয়ে ডপলারের সিদ্ধান্ত অবশ্য উল্লেখ্য। আলোকচিত্র, চশমার লেন্স[২৫], স্পেক্‌ট্রোস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতির আবিষ্কার এই প্রায়োগিক উৎকর্ষকে সম্পূর্ণ করে ও অধিকতর বিশুদ্ধির সঙ্গে আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ে ও বিভিন্ন ধাতুর দৃগগত ধর্মের পরীক্ষায় সাহায্য করে।

তাপশক্তি-তাপগতিবিদ্যাঃ তাপ বিষয়ে গবেষণা ও আবিষ্কার শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে নয়, কারিগরী ও আর্থনীতিকভাবেও দূরপ্রসারী হয়েছে। আপেক্ষিক তাপ ও লীন তাপ নিয়ে ব্ল্যাকের গবেষণা, কঠিন ও তরল পদার্থের প্রসারণ সংক্রান্ত পরীক্ষা, গ্যাসের প্রসারণ সম্পর্কে গে-লুসাক সূত্র, পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরের পর্যালোচনা, তাপপরিবাহিতা, তাপশক্তির যন্ত্রশক্তিতে রূপান্তর বিষয়ে জুলের আবিষ্কার, সঙ্কট তাপমাত্রা ও সন্ধি অবস্থার উত্থাপন একদিকে তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে; অন্যদিকে

তাপমিতি ও ক্যালরিমিতির প্রচলন, Savery-র অগ্নিচালিত পাম্পের ব্যাপক বিস্তৃতি করে বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কার ও ওয়াট প্রমুখর বাষ্পীয় ইন্‌জিন-কর্মপ্রণালীর উন্নতি সাধন প্রায়োগিকভাবে বিজ্ঞান-সেবায় লাগে। এই পটভূমিতে জন্ম হয় তাপগতিবিদ্যার। জুলের তাপকে যন্ত্রশক্তিতে পরিণত করার কথা যা বলেছি তা থেকেই আসে তাপশক্তির যান্ত্রিক তুল্য-র প্রসঙ্গ। যন্ত্রশক্তির তত্ত্বের সঙ্গে তাপ-শক্তির তত্ত্বের এই অন্তর্নিহিত যোগাযোগ থেকে শক্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণার সূত্রপাত হয় এবং Helmholtz, থমসন, Clausius ও কেলভিনের হাত দিয়ে ওই ধারণা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এর ফলে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। শক্তি সংরক্ষণ তত্ত্ব হল তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্রটি হল এই যে, তাপকে যান্ত্রিক কাজে লাগাতে হলে এক তাপমাত্রা থেকে অন্য তাপমাত্রায় তাপের ধারাবাহিক পরিবহণ অবশ্য প্রয়োজন। চূড়ান্ত তাপমাত্রা, দ্বিযোজ্যতা, বয়েলের সূত্রের উন্নত রূপ Waals-এর সমীকরণ, Raoult-এর সূত্র, তাপীয় পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক পরিবহণের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ম্যাক্সওয়েলের তাপের গতিতত্ত্ব, বিকিরণের ক্ষেত্রে তাপগতির সূত্রকে প্রয়োগ করে Stefan ও Wien-এর সূত্রদ্বয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাপগতিবিদ্যার প্রভূত উন্নতি ঘটে। ক্রমে এই শাখায় পরিসংখ্যানের প্রয়োগ ঘটে, বলবিদ্যার সূত্র প্রযুক্ত হয় যার চূড়ান্ত রূপ প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বে।

শব্দ-যন্ত্রবিদ্যা : Fourier-এর ত্রিকোণমিতিক শ্রেণীকে শব্দের আলোচনার কাজে লাগালেন Ohm, ব্যতিচার, সঙ্কম্পন ও সুস্বনতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হল, শব্দতরঙ্গ, শব্দের বিস্তার ও অনুরণন গবেষণার আওতায় এল, অনুশীলন হল কম্পন ও কম্পনশীল বস্তু বিষয়ে, শব্দকে অন্যান্য ভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবহারিক স্বনবিদ্যারও উন্নতি আনা গেল। অণুঘটিত অনুসন্ধানের কাজে শব্দকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে Biot ও Chladni-র নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্যালিলিওদের আমলে যন্ত্রবিদ্যার যে রূপ ছিল কালক্রমে তা

হয়ে পড়ল আরও সূক্ষ্ম ও জটিল। ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তার অভাবনীয় প্রয়োগ ঘটতে লাগল। যন্ত্রবিদ্যা থেকে আমরা এলাম বলবিদ্যায়। এই সময়ের গবেষণার মধ্যে হ্যামিলটনের গবেষণা প্রধান। সফিস্‌টিকেটেড অবস্থায় বলবিদ্যার রূপ কী হয়েছিল তার প্রমাণ অন্যান্য শাখার আলোচনায় পেয়েছি। গিবসের এবং ম্যাক্সওয়েল ও Boltzmann-এর মাধ্যমে তা পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা ও প্লাঙ্কের মাধ্যমে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার রূপ পেল। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এমনকি বলবিদ্যার প্রচলিত সূত্রগুলির (যার অনেকটা নিউটন-কৃত) সম্পূর্ণ বিরোধীই ছিল।

বিদ্যুৎশক্তি-চৌম্বকশক্তি ঃ তাপের মত বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারও দূরপ্রসারী হয়েছে। বিদ্যুতের প্রথম বৈজ্ঞানিক ধারণা পাওয়া গেছিল ঘর্ষণজনিত প্রতিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ থেকে। গ্রে-র পরিবাহক ও অপরিবাহক বিষয়ে পরীক্ষা, তড়িতের প্রকারভেদ ও বৈদ্যুতিক শকের পর্যবেক্ষণ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতাধান সম্পর্কে ফ্রাঙ্কলিনের ব্যাখ্যা, স্থিতিবৈদ্যুতিক আকর্ষণ ও চৌম্বক-আকর্ষণ পরিমাপের কুলম্ব আবিষ্কৃত সূত্র, ওই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। উনিশ শতকে এসে পাওয়া যায় ভোল্টার গতিবিদ্যুতের আবিষ্কার যা পদার্থের গঠন সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়, বিদ্যুৎ-প্রবাহ যে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অ্যামপিয়ারের গবেষণা যা বিদ্যুৎগতিবিদ্যার প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটায়, Oersted-এর যুগান্তকারী আবিষ্কার তড়িৎ চুম্বকত্ব, ফ্যারাডের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের আবিষ্কার যা action at a distance সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে সমূলে নাড়া দেয় ও বসকোভিচের সহায়তায় যা ম্যাক্সওয়েল ও Hertz-এর তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রতত্ত্বের ভ্রূণ স্বরূপ হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎশক্তি ও চৌম্বকশক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগাযোগ চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পায়। শব্দতরঙ্গ ও আলোকতরঙ্গের মত বৈদ্যুতিকতরঙ্গের, বলা ভালো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব ও মহাজাগতিক চুম্বকত্ব, আবিষ্কৃত হয়। রসায়ন ও আলোকবিজ্ঞানের গবেষণাতেও বিদ্যুৎ ও

চুম্বকশক্তির বিভিন্ন অনুষঙ্গের সফল প্রয়োগ ঘটে। আর নানান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও শিল্পে বিদ্যুতের প্রয়োগের ফলে ব্যাপক কারিগরী সমৃদ্ধির কথা তো সবারই জানা আছে।

পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ঃ পদার্থের গঠন বিষয়ে আমাদের যে বর্তমান, প্রচলিত, পারমাণবিক ধারণা যে সমস্ত পদার্থই অণুতে এবং অণু আবার পরমাণুতে বিভক্ত তার প্রথম প্রকাশ ডালটনের তত্ত্বে (১৮০৮), অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পের সহায়তায় তিনি বিভিন্ন মৌলের সঠিক পারমাণবিক ওজনের গণনায় সফল হতে যে তত্ত্ব পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেল। ১৮৫০ নাগাদ এই বিষয়ে যে বিতর্ক দেখা দিল তা পারমাণবিক ওজনকে কেন্দ্র করে, পরমাণুর গঠন বা সংবিধানকে কেন্দ্র করে নয়। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও কয়েক দশক। ১৮৯৫-এ রঞ্জন কর্তৃক এক্স-রে, ১৮৯৭-এ থমসন কর্তৃক ইলেকট্রন ও ১৮৯৮-এ Becquerel কর্তৃক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর পরমাণু নিয়ে তদন্ত ও গবেষণা যেমন বাড়ল তেমনি বহু নতুন মৌলকণাও আবিষ্কৃত হতে লাগল। এই সমস্ত কণার ক্রিয়া ও চরিত্রের তথ্য থেকে বিজ্ঞানের আধুনিক মৌল তত্ত্বগুলি—স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রতীতি, কারণ ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, ডিটারমিনিজম—ধীরে ধীরে রূপ পেল। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ব্র্যাগ পদার্থের কেলাসীয় গঠন ও জটিল অণুর সংগঠন পরীক্ষা করলেন, মাদাম কুরি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম, রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয়তার প্রতীতিকে স্পষ্টতর করলেন, আলফা ও বিটা রশ্মি তাঁর দ্বারা চিহ্নিত হল, গামারশ্মি ধরা পড়ল Villard-এর হাতে। থমসন ইলেকট্রনের আধান ও তার ভরের অনুপাত গণনা, Soddy পারমাণবিক ওজন যে মৌলের রাসায়নিক ধর্মের তেমন নিয়ন্তক নয়, এই ধারণার প্রতিষ্ঠা এবং উইলসন, রাদারফোর্ড ও গেইগার পারমাণবিক ধর্ম ও পারমাণবিক পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করলেন। কেন্দ্রে সম্বদ্ধ নিউক্লিয়ার পরমাণুর ধারণা তৈরি হল। এই সবের উপর ভিত্তি করে গঠিত হল পরমাণুর সামগ্রিক সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব। পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর চলতে লাগল ; ম্যাক্সওয়েলের গবেষণার

ফল আণববিজ্ঞানে প্রযুক্ত হল; বোর বললেন, পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিত ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিদ্যুৎগতিবিদ্যা প্রযুক্ত হয় না, ফলে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্য নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন বোর পরমাণু-নকশা; de Broglie ইলেকট্রনকে একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ গতি বলে তাকে দ্বৈতধর্ম দিলেন, নিউট্রন আবিষ্কৃত হল, ডিরাক ধনাত্মক ইলেকট্রনের অস্তিত্বের কথা বললেন যা পরে পরীক্ষামূলকভাবে ধরা পড়ল. কল্পনা করা হল মেসনের যা পরে মহাজাগতিক রশ্মিতে দৃষ্ট হল। আণববিজ্ঞানের উন্নতি চলল নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে। পরমাণু বোমা আবিষ্কৃত হল, যুদ্ধে তার প্রয়োগ ঘটল, ধ্বংসের বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখে স্তম্ভিত হল মানুষ। তখন পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আবেগ জাগল মানুষের। শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ শুরু হল, তারই পাশাপাশি চলল পরমাণু অস্ত্র মজুতের প্রতিযোগিতা। মজুত করতে করতে আজ এত অস্ত্র জমেছে যে তা দিয়ে ষাটবার ধ্বংস করে দেওয়া যায় পৃথিবীকে।

ঘনপদার্থবিজ্ঞান : এটি বিংশ শতাব্দীতে প্রস্তাবিত, পদার্থ বিজ্ঞানের একটি তুলনামূলক ও নতুন শাখা। পারমাণবিক গবেষণা পদার্থের মৌলিক গঠন সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে তাতে পদার্থের কঠিন অবস্থার সংশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা ও ঘনপদার্থের সংবিধান ও সংগঠন নিয়ে জটিল অনুশীলনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে আছে জোফি, টেলর, ফ্রাঙ্ক, রীড, মেম্যান ও Mossbauer-এর গবেষণা।

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান : বিকিরণের অন্যতম প্রধান সমস্যার—উত্তপ্ত পদার্থের তাপ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘের উপর বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণ কীভাবে নির্ভরশীল—সমাধানে প্লাঙ্ক সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বিকীর্ণ শক্তি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিচ্ছুরিত না হয়ে ঝলকে ঝলকে সূক্ষ্ম কণার আকারে বিচ্ছুরিত হয় যে কণার তিনি নাম দেন কোয়ান্টা। তিনি প্রতি কোয়ান্টার কর্মশক্তির পরিমাণ $E=hv$ নির্দিষ্ট করেন, যখন v বিকীর্ণ রশ্মির কম্পনের হার ও h প্লাঙ্কের ধ্রুবক—অন্যান্য বিশ্বধ্রুবকের মত

একটি গাণিতিক সত্য। কোয়াণ্টাম তত্ত্বে অসম্বন্ধ গণিত প্রথম গুরুত্ব পেল, এতদিন বিজ্ঞানে প্রয়োগ হত মূলত নিরবচ্ছিন্ন সেটের গণিত। আলো তাপ এক্সরে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ শক্তি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়াণ্টায় স্থানের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে ও আলোর ক্ষেত্রে তা ফোটন নামক বিচ্ছিন্ন শক্তিকণার দ্বারা গঠিত, আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন। আলো তরঙ্গসমষ্টি দ্বারা না কণিকা দ্বারা গঠিত এ প্রশ্ন ইতিপূর্বে কথিত দ্বৈতধর্মেরই আর একটি দিক মাত্র। শ্রয়ডিংগার ও অন্যদের প্রচেষ্টায় মৌলকণায় তরঙ্গ ধর্ম আরোপিত হয়ে কোয়াণ্টাম বিষয়গুলি ব্যাখ্যার একটা পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করে, এর নাম তরঙ্গ বলবিদ্যা। এরই পাশাপাশি হাইসেনবার্গ মেট্রিক্স প্রণালীর সাহায্য নিয়ে কোয়াণ্টাম ঘটনাবলীর নির্ভুল বর্ণনায় কণিকা বা তরঙ্গের সমষ্টিগত ধর্মের বিবেচনা প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং সম্ভাবনাসূত্র ও আকস্মিকতার প্রয়োগে পদার্থ তরঙ্গকে সম্ভাবনা তরঙ্গে রূপান্তরিত করে কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার রূপ দেন। পরে তরঙ্গ বলবিদ্যা ও কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা হিলবার্ট দেশ তত্ত্বের সাহায্যে একই সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হয় ও এই প্রসঙ্গে ডিরাকের ফাংশন সমষ্টির গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। সেয়াজ ফাংশন তত্ত্ব সাফল্যের সাথে সম্প্রসারিত করে বণ্টন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যাতে আলোচ্য বস্তুকে জড়ের বণ্টন বা সম্ভাবনার বণ্টন রূপে দেখা হয়। একই অস্তিত্বের তরঙ্গরূপ ও কণিকারূপকে পরস্পরের বিরোধী না ধরে পরস্পরের পরিপূরক বলে স্বীকার করায় কোন অনিশ্চয়তা আছে কিনা তার ব্যাখ্যায় ১৯২৭-এ হাইসেনবার্গ[২৬] তাঁর যুগান্তকারী অনিশ্চয়তা তত্ত্বে দেখান যে পদার্থের আদি প্রকৃতি থেকেই এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি। তাই ইলেকট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান একই সময়ে নির্ণয় করা অসম্ভব, কোন বিশেষ ইলেকট্রন সম্বন্ধে বড়জোর এই বলতে পারা যাবে যে ইলেকট্রন দলের জটিল উপরিস্থাপিত তরঙ্গ গতির কোন বিশেষ বিন্দুই হয়তো বা ওই ইলেকট্রনের অবস্থান। এই অনিশ্চয়তা প্রাকৃতিক নিয়ম পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত ও মহাজাগতিক

ভবিষ্যতও তাই অনির্দিষ্ট। যদিও আইনস্টাইনকে নিয়ে পৃথক আলোচনা করব তবু তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক কথা বলতে হবেই। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এই বলে যে আলোর গতিবেগ সর্বত্র, সর্ব অবস্থায় এক, প্রেরক বা গ্রাহকের গতিবেগের জন্য আলোর গতিবেগের কোনই পরিবর্তন হয় না। অবিরামভাবে গতিশীল মহাজগতে শুধুমাত্র একের সাথে অন্যের তুলনা করেই গতির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে কেননা পারস্পরিক সম্বন্ধই শূন্যস্থানের অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থাৎ নিরপেক্ষ স্থান বলে কিছু হয় না, নিরপেক্ষ কাল বলেও কিছু নেই কেননা কাল ঘটনার যুক্তিসংগত বিন্যাস মাত্র। জগতের কর্মপ্রণালীর বর্ণনায় প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয়, শূন্যস্থান কাল ও ভরের মধ্যে স্থান ও কাল যেমন গতি ও জগতের উপর নির্ভরশীল, ভরও তেমনই পরিবর্তনীয়, আপেক্ষিক। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভরও বৃদ্ধি পায়। এখন গতি এক প্রকার কর্মশক্তি, ফলে পদার্থের ভরবৃদ্ধি ও তার কর্মশক্তি বৃদ্ধি একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত। সোজা কথায় ভর কর্মশক্তিরই জমাট অবস্থা। এবং একটিকে অপরটিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, ভর ত্যাগ করে কোন পদার্থ যদি আলোর গতিবেগের কাছা-কাছি গতিবেগে চলতে থাকে তাকেই আমরা বিকিরণ বা কর্মশক্তি বলব। আর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ শূন্যস্থান ও আপেক্ষিক কালের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক চার মাত্রিক বিস্তৃতি হিশেবে জগতকে তুলে ধরে, তিন মাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল। এর বিস্তৃত আলোচনা পৃথকভাবে করব। তার আগে স্থান কাল বিস্তৃতির গণিতে কাউস্‌কির অবদান এখানে উল্লেখ্য।

আইনস্টাইন (১৮৭৯—১৯৫৫): সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির মূল রূপে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যে চারটি মিথস্ক্রিয়ার উল্লেখ করে যে মিথস্ক্রিয়া মৌলিক উপাদানগুলির—কণা বা ক্ষেত্র—মধ্যে ক্রিয়াশীল তা হল, (i) তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি (ii) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (iii) weak forces that show up in many kinds of particle

decay ও (iv) strong forces that hold atomic nuclei together. আইনস্টাইন তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বে প্রথম দুটি শক্তির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন।[২৭] সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে যে চারমাত্রিক বিস্তৃতির অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলা হচ্ছে বস্তুর উপস্থিতি সেই অবিচ্ছেদ্যতাকে মুচড়ে দেয় (কার্ভড স্পেস), এই অবস্থাটিই আমাদের কাছে মাধ্যাকর্ষণ নামে পরিচিত, যার জন্য কোন গতিশীল বস্তুর চলার পথ বক্ররেখা হয়ে ওঠে, যেমন মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে আলোকরশ্মির বিক্ষেপ। মাধ্যাকর্ষণের কারণে বর্ণালীর লাল রঙের দিকেও আলোকরশ্মি সরে যায়। বুধ গ্রহের গতিপথের অনিয়মের ব্যাখ্যাও মেলে এই তত্ত্ব থেকে। আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থেকে একেবারে আলাদা। তিনি বলেন, মাধ্যাকর্ষণ গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথে তাদের নিজস্ব জড়তা থেকেই উদ্ভূত এবং তাদের গতিপথ শূন্যস্থানকাল বিস্তৃতির পরিমাপ যোগ্য গুণের দ্বারা নির্দিষ্ট। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ, যার বিস্তৃত আলোচনা আগে করেছি, গণনায় লরেণ্টসের পরিবর্তন বিধি সমীকরণের সাহায্য নিয়েছিল, যে বিধিতে আলোর গতিবেগকে অপরিবর্তনীয় রেখে, গতিশীল জগতের স্থান ও কালকে গতিহীন দর্শকের অবস্থায় আনয়ন করা যায়।

আজ মানুষের জ্ঞানের বহিঃসীমা নির্দেশ করে আপেক্ষিকতাবাদ আর অন্তঃসীমা নির্দেশ করে মৌল কণা সম্বন্ধে প্রাপ্ত তত্ত্বসমাহার। এই দুই তত্ত্বের মিলনই বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, তাই একদিকে পদার্থবিজ্ঞানকে যেমন নানা শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে আবার বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরিপূরকতা ও সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টাও চলছে। সমস্ত পদার্থকে কতকগুলি মৌলিক পদার্থে বিভক্ত করে সেই মৌল পদার্থগুলিকে আবার পরিণত করা গেছে বিশেষ বিশেষ কণার ধারণায়। একইভাবে সমস্ত প্রকার শক্তিকেও সংহত করা গেছে এক কর্মশক্তির ধারণায়। তারপর পদার্থ ও কর্মশক্তিকেও পরিণত করা হয়েছে একটিমাত্র মূল উপাদানে। কিন্তু সেই মূলটি

কী তা আজও অজ্ঞাত। একে খুঁজে পাওয়া শুধু চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনই নয়, মানবসভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও।

রসায়ন

একটি সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞান হয়ে ওঠার জন্য রসায়নের প্রয়োজন ছিল সুগ্রথিত রাসায়নিক তত্ত্বের। দেখিয়েছি এর সূচনা হয়েছিল আঠারো শতকে। তত্ত্বের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এর পরেও চলতে লাগল। যাঁদের কথা আগে বলেছি, ল্যাভয়েসিয়র ও প্রিষ্ট্‌লে, এবং সমসাময়িক ক্যাভেণ্ডিশ, Berthollet, Richter প্রমুখের গবেষণার মধ্য দিয়ে রসায়ন আসক্তি ও প্রক্রিয়ার সূত্রগুলি পেতে থাকল। পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক জোরদার হল ও শিল্পে তার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটল। উনিশ শতকে এসে রসায়নে বিভিন্ন শাখার প্রয়োজন অনুভব করা গেল।

অজৈব রসায়ন ঃ অজৈব রসায়নের একটি দিক ছিল পারমাণবিক তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত, যে দিকটির কথা পরে আসছে। বিদ্যুতের গবেষণায় এর দ্বিতীয় আর একটি অনুষঙ্গ পাওয়া গেল। ফ্যারাডে তড়িৎ-রাসায়নিক বিযোজন নিয়ে গবেষণা, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড রাসায়নিক যোজ্যতার প্রস্তাবনা ও তড়িদ্‌বিশ্লেষণের সাহায্যে ডেভি যাবতীয় মৌল পদার্থকে ধাতু ও অধাতু এই দুই ভাগে বিভাজন করলেন। Berzelius ও নিকল্‌সনের প্রচেষ্টায় রাসায়নিক আসক্তির কারণ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে বহু তথ্য জানা গেল, যা অনেক অজৈব যৌগ ও খনিজ দ্রব্যের সংবিধান নির্ধারণে সাহায্য করল। ক্রমে পদার্থের গঠন-সংযুতি থেকে আগ্রহ সরে এল একাধিক পদার্থের মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তার ধারা, ও দ্রবণ কেলাসন অনুঘটন তাপের প্রভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গে বেশি করে। অজৈব রসায়ন ভৌত রসায়নের, যা ছিল প্রথম সংকর বিজ্ঞান, উন্নত রূপ পেল। বস্ত্র খনিজ উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্পে বিশেষভাবে

প্রযুক্ত হয়ে তা রসায়নশিল্পেরও জন্ম দিল, যা ক্রমে ক্রমে আরও বহু শিল্পকে নিজের আওতায় টেনে নিল। অবিরাম প্রবাহ, অনুঘটন ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি এই শিল্পে দারুণ সমৃদ্ধি আনল। পলিমার প্ল্যাস্টিক ফাইবার নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার হল। ভারী ও সূক্ষ্ম, এই শিল্পের দু দিকেই উন্নতি হতে লাগল সমান গতিতে। এই উন্নতি যেমন মানুষের অপরিসীম উপকারে এল তেমনি এর ফলে রসায়নের নিজস্ব মননঘটিত একটা ক্ষতিও হল যে, বিশুদ্ধ রসায়ন আজ ক্রমেই হয়ে পড়ছে প্রায়োগিক রসায়ন, রসায়নশিল্প।

পারমাণবিক তত্ত্বঃ ডালটনের পারমাণবিক তত্ত্ব রসায়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। সমস্ত রাসায়নিক যৌগ পরমাণু নির্মিত প্রমাণিত হল। আভ্যন্তরীণ পরমাণুসজ্জার ওপর নির্ভর করে যৌগের প্রকৃতি, তাই দুটি মৌলিক পদার্থ, যেমন নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে বিবিধ যৌগিক পদার্থ গঠিত হতে পারে—NO, NO_2, N_2O. স্থিতিবৈদ্যুতিক আবেশে শক্তিপ্রেরণ দূরত্ব দ্বারা যতটা না নিয়ন্ত্রিত হয় তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে আণবিক গঠনের ওপর, অ্যাভোগাড্রোর এই ধারণা থেকেই পরমাণুতত্ত্ব ধীরে ধীরে রূপ পেয়েছিল। বিভিন্ন কেলাসের আণবিক গঠন পর্যবেক্ষণ করা গেল, একই ধরনের যৌগের কেলাসরূপ সদৃশ হয় প্রমাণিত হল, পারমাণবিক ওজনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হল। Kossel, Lewis ও Langmuir-এর তত্ত্ব, পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করে কীভাবে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়ন হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যা দিতে ভৌত রসায়ন চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—(i) সেই সমস্ত বিরল গ্যাস যেখানে সব ইলেকট্রন পরমাণুর সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে থাকে, (ii) ধাতু সমূহ, যেখানে ইলেকট্রনের আধিক্য রয়েছে, (iii) অধাতুসমূহ, যেখানে ইলেকট্রনের স্বল্পতা রয়েছে, (iv) লবণসমূহ, যেখানে ধাতু ও অধাতু-আয়নের মধ্যে বিনিময় ঘটে থাকে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশের ফলে এই বিভাজন একই সঙ্গে পরিমাণাত্মকও হয়ে ওঠে। শিলা ও খনিজদ্রব্যের জটিল গঠনের অনুধাবনে ও ধাতু ও সঙ্কর ধাতুর বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে অগ্রগতি

এল। যোজ্যতা ও আন্তর্পারমাণবিক বন্ধনের কোয়ান্টাম সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়ায় অধাতব যৌগের পরীক্ষা সম্ভব হল। বুঝে ওঠা গেল শৃঙ্খল বা পৌনঃপুনিক বিক্রিয়ার ক্রিয়া-পদ্ধতি। Mendeleev বিরানব্বইটি মৌল পদার্থের এক বিস্তৃত সারণী সঙ্কলন করলেন। পারমাণবিক সংখ্যা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেল, বিশুদ্ধ ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ[২৮] এবং ভারী জল হয়ে উঠল রসায়নবিদের অন্যতম হাতিয়ার।

জৈব রসায়ন ঃ পাচন ও প্রশ্বাসের মতো জৈব প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকেই জৈব রসায়নের জন্ম। তৈল, শর্করা, স্নেহ ও সুরা-জাতীয় পদার্থের নিষ্কাশন ও শোধন ধীরে ধীরে শুরু হল, তাদের জৈবগঠন সম্পর্কে ধারণা জন্মাল। দুমা, Liebig ও অন্যদের গবেষণায় অণু-কল্পন, ভ্রূণমুকুল ও সমাংশন বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরি হল। এবার জৈব রসায়নে প্রযুক্ত হল পারমাণবিক তত্ত্ব। সদৃশ অবস্থায় একই আয়তনের সমস্ত গ্যাসে সমসংখ্যক অণু থাকবে, অ্যাভোগাড্রোর এই সূত্র ও পাস্তুরের অপ্রতিসম অণু নিয়ে গবেষণার ফলে ঐ প্রয়োগ সম্ভব হল। আণবিক রূপের উপর যে রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত, Kekule-এর যোজ্যতা বিষয়ে চিত্রগত সংজ্ঞা আর হফ ও বেলের ত্রিমাত্রিক সংযুতি-সঙ্কেত জৈব রসায়ন ও পরমাণুতত্ত্বকে নিবিড়তর বন্ধনে বাঁধল। ভেষজ, ঔষধ ও রঞ্জক শিল্পে এবং খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণায় জৈব রসায়নের প্রয়োগ ঘটল। অজৈব পদার্থগুলি জৈব প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কী ঘটে সেই সম্পর্কে ধারণা ক্রমে জৈব রসায়নকে প্রাণ রসায়নের দিকে ঠেলে দেয়। প্রাণীর দুই প্রধান জৈবক্রিয়া—খমন ও জারণ, এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ; চার প্রকার মৌল জৈব পদার্থ—অ্যামিনো অ্যাসিড, দ্বিবন্ধী অণুবলয়, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্য; এনজাইমের[২৯] কর্মপদ্ধতি; সহ-এনজাইম, খাদ্যপ্রাণ, হরমোন ও অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার; আর রক্তের শ্রেণীকরণ প্রাণরসায়নের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন প্রমাণ। প্রোটিন অণুর গঠন, বলয়াকার প্রোটিনের উৎপত্তি ও গঠন এবং জৈব প্রক্রিয়ার

তাপগতিবিদ্যক বিশ্লেষণ বিকাশের অন্যান্য প্রমাণ। গবেষণা চলছে বেনজিন বলয় ও বৃহৎ অণু নিয়েও। অগ্রগতির আরও উদাহরণ মিলবে জীববিদ্যার আলোচনায়।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় রসায়নের প্রয়োগ : ভৌত ও জৈব রসায়ন আর পারমাণবিক তত্ত্ব, রসায়নের তিন শাখাতেই অগ্রগতির সূচনা হয়েছে উনিশ শতকে। এটা সম্ভব হয়েছে কাজ করার যন্ত্রপাতির উন্নতি আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী কলাকৌশলের উদ্ভাবন একই সঙ্গে হওয়ার ফলে। ঘুরিয়ে বলা যায় রসায়নের তত্ত্ব ও রাসায়নিক টেক্‌নোলজির মিলন হওয়ায়। এই যে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সহযোগিতা দিয়ে তাকে উন্নত করে তুলল তার প্রতিদানে রসায়ন বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় প্রযুক্ত হল, হতে লাগল, অপ্রতিহত গতিতে। পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আগে একবার তুলেছি। এ প্রসঙ্গে এখন বলা যেতে পারবে রাসায়নিক গতিবিদ্যা, তাপরসায়ন, শক্তির রাসায়নিক তুল্য ও দ্রবণের ভৌতধর্মের কথাও। অবশ্যই বলতে হবে সালোক সংশ্লেষণের প্রাণ রাসায়নিক প্রণালীকে তাপ, আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরীক্ষার কথা। এরপর আসবে জীববিদ্যার সঙ্গে রসায়নের সম্পর্ক। প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, কোষ ও জীবাণু-তত্ত্ব সর্বত্র আজ প্রযুক্ত হচ্ছে রসায়ন। বিভিন্ন প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার যতটা জীববিদ্যক প্রয়াস তার চেয়ে কিছু কম রাসায়নিক সাফল্য নয়। কৃষি বিষয়ক অসংখ্য আধুনিক অবদানের জন্য রসায়ন দায়ী। সমান কৃতিত্ব জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা গড়ে তোলার কাজে। এইবার বলব চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়নের সম্পর্কের বিষয়ে। এই সম্পর্ক রোগ নির্ধারণ, রোগ নিরাময় ও ঔষধ প্রস্তুতি, তিনটিতেই কার্যকরী হয়েছে। মরফিন, এট্রোপিন, কুইনাইন, চেতনানাশক ও জীবাণুনাশক দ্রব্য আবিষ্কার; অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট ওষুধের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঘটিত অসুখ থেকে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও মনের অসুখ পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের প্রতিকার; খাদ্যপ্রাণ,

শিশুখাদ্য ও প্রতিরোধকের রাসায়নিক প্রস্তুতি; এবং কৃত্রিম রক্ত ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা ওই কার্যকরী সম্পর্কের প্রমাণ। এ ছাড়া রসায়ন প্রযুক্ত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, খনিজবিদ্যায়, নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে। এত ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে ভূতত্ত্বে যে ভূরসায়ন নামে একটি পৃথক শাখারই প্রয়োজন হয়েছে। আর সর্বোপরি প্রযুক্ত হয়েছে শিল্পে। মানুষের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান বিলাস, প্রাথমিক সবকটি প্রয়োজন মেটাতে হাত লাগিয়েছে রসায়ন। এ ছাড়াও ধাতু কৃষি ও জ্বালানী শিল্প, বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ ও বিকল্প শক্তির সন্ধানও রসায়নের গণ্ডীর আওতায়। রসায়ন আজ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া বিজ্ঞান।

রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ এক. অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তুলনায় রসায়নবিদরা তাঁদের নিজস্ব বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কে কম আগ্রহী। তাঁরা এই বিষয়টি অধ্যয়ন করেন মূলত ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত কারণে, মননধর্মী উত্তেজক ও গতিশীল এক বিজ্ঞান হিশেবে ততটা নয়।

দুই. এই কারণের জন্যই রসায়নের ইতিহাস আরও বেশি করে মূল্যবান হওয়া উচিত। যে ইতিহাসের একাংশে আছে প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ আর তাঁদের আবিষ্কার ও গবেষণার ইতিহাস এবং অন্য অংশে আছে যে বৈজ্ঞানিক / সামাজিক অবস্থা / ভাবনা রসায়নের গবেষণায় পৃষ্ঠভূমি হিশেবে কাজ করেছিল তার বিশ্লেষণ।

তিন. ফলে রসায়নের বিজ্ঞানে ধারাবাহিকতার প্রয়োজন রয়েছে। রসায়ন বর্তমানে খুব বেশি পরিমাণে প্রাযুক্তিক হয়ে ওঠায় এবং যে কোন প্রাযুক্তিক বিজ্ঞান চূড়ান্ত ফলকে বেশি গুরুত্ব দেয় বলে রসায়ন আজ বর্তমান সাফল্যের মুখাপেক্ষী হতে আগ্রহী, সামগ্রিক মূল্যায়নের নয়। অর্থাৎ ধারাবাহিকতার বদলে রসায়নে এখন তাৎক্ষণিকতার প্রাধান্য।

চার. রসায়ন সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে পূর্বোক্ত তাৎক্ষণিকতার মোহকে সামাজিক প্রয়োজন মনে করার

এক প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। যা বৈজ্ঞানিক ভাবে, ফলে সামাজিক ভাবেও ক্ষতিকর। এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে রসায়নে বিশুদ্ধ ও তাত্ত্বিক অগ্রগতি আরও বেশি ও আরও দ্রুত হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

জীববিজ্ঞান

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : যে সমস্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণে অষ্টাদশ শতক থেকে জীববিজ্ঞানের চর্চা বাড়ল ও ফলে অগ্রগতি দেখা দিল তা হল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভৌগলিক অভিযান চালানোর প্রবণতা, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিস্তৃত ও উন্নত করার বাস্তব প্রয়োজন, কৃষিসংক্রান্ত প্রয়োজন ও সমস্যা এবং যন্ত্রশিল্পে নানা ধরনের কাঁচা-মালের দাবী। জীববিজ্ঞানে আনুপাত্তিক পর্যবেক্ষণের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, এর সাথে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূতত্ত্বের বিভিন্ন জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে এই শাখায় দ্রুত উন্নতি আনল। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের বহিরঙ্গ, অন্তর্গঠন ও জৈব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হল, নানা সমস্যার উত্তর মিলল। রসায়নে যেমন হয়েছিল ঠিক সেইভাবে জীববিজ্ঞান নিয়মানুগভাবে পরীক্ষামূলক হয়ে উঠল ও তার পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলকে কাজে লাগাবার মত বিবিধ ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও প্রকৃতিতে মানুষের স্থান, এই দুটি বিষয় নিয়ে উনিশ শতকে এক ব্যাপক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে যা থেকে প্রকৃতিদর্শনের উদ্ভব, এর পেছনে জীববিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্যে যে বিপুল অর্থনৈতিক প্রগতি দেখা গেল তাও ব্যবহারিক জীববিজ্ঞানের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। একেবারে মৌল অস্তিত্ব নিয়ে কাজ করে বলে জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞান বা রসায়নের তুলনায় দেখা যাবে অনেক কম সূত্র-বদ্ধ হতে বাধ্য।

উদ্ভিদবিদ্যা: বিজ্ঞানের এই শাখায় প্রথম ব্যাপক অবদান জন রে-র। তারপর Camerarius সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ফুল হল উদ্ভিদের যৌনাঙ্গ। এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রেরণা নিয়ে Linnaeus সমস্ত প্রকার উদ্ভিদকে (নানা ধরনের প্রাণীকেও) সরল কিন্তু যুক্তি-সংগত প্রণালীতে শ্রেণীবিভক্ত করলেন, যে প্রণালী কিছু পরবর্তী পরিমার্জন সহ আজ পর্যন্ত স্বীকৃত ও কার্যকরী। তাঁর প্রণালীকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃতিক প্রণালীতে রূপান্তরিত করার কাজে Buffon-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রমে নানা প্রকার উদ্ভিদ ও ছত্রাক, এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ, ফুল ফল পাতা, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হল; পুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীকরণ ও বিশেষ কয়েকটি উদ্ভিদগোষ্ঠী নিয়ে অনুশীলন সম্ভব হল; একবীজী ও বহুবীজী, গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী—বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেল। পত্রবিন্যাস ও অঙ্গসংস্থান চর্চার প্রচলন হল, নতুন শাখা প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যা আত্মপ্রকাশ করল, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের প্রাকৃতিক সম্পর্ক ও তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং উদ্ভিদদের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে মূল্যবান আবিষ্কার হল। তখন থেকে পরিবেশবিজ্ঞান বা বাস্তব্যবিদ্যা রূপ পেতে শুরু করে, বিজ্ঞানের এক শাখা এইভাবে আর এক শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রাণীবিদ্যা: পশুপালন রীতির বিস্তার ও ভৌগলিক অভিযানে নতুন নতুন প্রাণী আবিষ্কারের ফলে প্রাণীবিদ্যায় যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তার প্রথম কাজ হল উপযুক্ত পরিভাষা ও শ্রেণীকরণের পর্যাপ্ত প্রণালী নির্ধারণ করা। সতেরো শতকের সূচনায় প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে আমাদের কতটা জ্ঞান ছিল Aldrovandi-র মহাগ্রন্থে তার প্রমাণ মিলবে। ক্রমে শুধু পশু বা পাখি নয়, পতঙ্গ সম্বন্ধেও জ্ঞান বৃদ্ধি পেল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা প্রাণীবিজ্ঞানেও অবদান রাখছিলেন, যেমন শল্যচিকিৎসার ও অণুবীক্ষণযন্ত্রের উন্নতি হতে শরীরতত্ত্বেও অগ্রগতি হল। বিশেষ বিশেষ প্রাণীর বিশদ বৈজ্ঞানিক গঠনবর্ণনা, বিভিন্ন প্রজাতির গঠন ও ক্রমবিকাশ এবং প্রাণীর জননক্রিয়া ও বংশবৃদ্ধি—

সমস্ত বিষয়েই বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল। কলাকৌশলের উন্নতির ফলে প্রাণীবিদ্যার গবেষণায় সম্পর্কভিত্তিক শ্রেণীকরণ ও প্রণালীকরণের প্রাধান্য ঘটল, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণের ও তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস দেখা দিল। প্রত্নজীব-বিদ্যা, প্রোটোপ্রাণীবিদ্যা, সমুদ্রপ্রাণী ও পরজীবী-বিদ্যা নামে নতুন ও ব্যবহারিক শাখার প্রচলন হল। শেষোক্ত শাখায় রুডল্‌ফির অবদান অনস্বীকার্য। প্রাণীদের ওপর আবহাওয়া ও পরিবেশের প্রভাবও অনুশীলনের আওতায় এল। তাদের আচার আচরণ চরিত্রের তথ্যগ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ শুরু হল। যার ফলে উৎসাহ ও সমৃদ্ধি এল মনোবিজ্ঞানে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরতত্ত্ব ঃ উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব শারীরস্থান ও জননক্রিয়ার নানা দিক নিয়ে কাজ করলেন Wolff, Sarrabat, Kolreuter ও Dutrochet। উদ্ভিদের স্নায়ুকম্পন ও প্রাণস্পন্দন সম্পর্কেও গবেষণা হচ্ছিল। উদ্ভিদপেশীর গঠন ও বিকাশ, সে খাদ্যসংগ্রহ করে ও পুষ্ট হয় কীভাবে, তার ওপর জল ও বাতাসের ভূমিকা কী, সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সব বিষয়েই নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হল। উদ্ভিদের লিঙ্গভেদ, জননক্রিয়া ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করলেন Amici, Hofmeister, Tulasne ও আরও অনেকে। প্রাণীর শরীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী, পরিপাকক্রিয়া ও পুষ্টি, রক্তসঞ্চালন, পেশীর ক্রিয়া-কলাপ ও স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ে গবেষণা হল। প্রায় সমস্ত ধরনের শরীর-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ভৌত ও রাসায়নিক কারণ নিয়ে Magendie, বিশেষত ওই প্রক্রিয়ার জৈব অনুষঙ্গাদি সম্বন্ধে বার্নার্ড ও শরীরতাত্ত্বিক রসায়নের বিবিধ প্রসঙ্গে Liebig কৃতিত্বের সাক্ষর রাখলেন। শরীর-তত্ত্বের আলোচনায় যেমন তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের বিষয়টি ছিল তেমনই ছিল মানুষের শরীরতত্ত্ব ও শারীরস্থান সম্পর্কে নিত্য নতুন তথ্যের আবিষ্কার, যার প্রথমটিতে Cuvier ও Saint-Hilaire-র বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে। যৌন পদ্ধতির মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। এই বিষয়ে কাজ

করতে গিয়ে ভ্রূণতত্ত্ব নামে একটি নতুন শাখার উদ্ভব হল, যার জন্য Haeckel, Herbst, Baer প্রমুখের প্রারম্ভিক অবদান প্রধান। এই ভ্রূণতত্ত্ব আর মানুষের শারীরস্থান বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব প্রজনন অংশে। এখানে এই বলে শেষ করছি যে কোষতত্ত্বের উদ্ভবের আগে মানুষ ও প্রাণীর শরীরে শক্তির রূপান্তর, স্নায়ু মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপের বলবিদ্যক অনুষঙ্গ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকলেও, দেহের কোষগুলি কী পদ্ধতিতে কাজ করে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না।

জীবাণুতত্ত্ব, অণুজীববিদ্যা ঃ উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী পাস্তুরের (১৮২২-১৮৯৫) হাত দিয়ে জীবাণুতত্ত্বের জন্ম হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় বিবিধ পরীক্ষা চালিয়ে খমিরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ এক ধরনের ছত্রাকের ভূমিকা তিনি প্রমাণ করে দেখান, যার ফল হয় যুগান্তকারী। জীবাণু আবিষ্কৃত হয় ও তারা দেহকোষ আর রক্তকণিকায় কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে। জীবাণু (ব্যাকটেরিয়ার) সঙ্গে সংক্রামক রোগের যোগাযোগ স্থাপন, প্যারাসাইট / ব্যাসিলিয়া / ভাইরাস সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং বহু মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করে পাস্তুর জীবাণু-বিদ্যাকে ব্যবহারিকভাবেও অমূল্য করে তোলেন। জীবাণুতত্ত্ব চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার কলা ও কোষ সম্বন্ধেও জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটায়। বস্তুত অণু-জীববিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, আবিষ্কার ও তত্ত্বের এক বড় অংশ হয় কোষতত্ত্ব নয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে জৈব কারণে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু গঠন সম্ভব হয় কোষতত্ত্বের সাহায্যে তার বিশ্লেষণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তায় তাদের বিনাশ। জীবাণু, জিন, কোষ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়কে জৈব অণুর অনুষঙ্গে স্থাপন করে অনুশীলনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এই অণু-জীববিদ্যার সূচনা হয়েছিল। সূক্ষ্ম অবয়বীদের রাসায়নিক বহুমুখীনতা ও অভিযোজন-ক্ষমতা, ভাইরাসের গঠন ও নিউক্লিয়োপ্রোটিন রূপে তাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, স্বাভিমুখী ও স্বভোজী জীবাণুর আচরণ

এবং প্রাণের উৎপত্তিতে প্রাণরাসায়নিক অভিব্যক্তির ভূমিকা, বিবিধ বিষয়ে[30] গবেষণার মধ্য দিয়ে এই শাখার পর্যাপ্ত উন্নতি ঘটেছে। এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে মৃত্তিকাবিদ্যা ও কৃষিশিল্পেও আর তারই সঙ্গে, লজ্জার কথা, যুদ্ধে ও প্রতিপক্ষ হননে। তাপ আর আলো দেয় যে আগুন তাকে দিয়ে ঘরে আগুন লাগানোর মতো এই হটকারিতা।

প্রজনন ঃ কোন একটি বিশেষ প্রাণীর কোন এক বিশেষ অঙ্গ বা ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্য অনেক সময় ওই প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, বা মানুষের ওই বিশেষ অঙ্গ বা ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে ওই গবেষণা সাহায্য করবে এই কারণেও নয়, বরং ওই বিশেষ অঙ্গটি কীভাবে কাজ করে বা বিশেষ ক্রিয়াটির রীতিপ্রণালী কী তা জানবার জন্য। প্রজনন এই রকমই একটি বিশেষ বিষয়। যৌনক্রিয়া ও ব্যবহারিক ভ্রূণবিদ্যা (Vogt উল্লেখ্য) বিষয়ক জ্ঞানের অগ্রগতি হতে প্রজনন রহস্যের অন্ধকার থেকে বিশ্লেষণের আলোয় চলে এল। কোষতত্ত্বে এর বিস্তৃত বিবরণ মিলবে। যৌনক্রিয়া ও প্রজনন শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, একই সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পরিব্যক্তি এবং বীজপ্লাজম নির্বন্ধ এই তিনটি বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি যেমন প্রজনন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছে, সেই রকম যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের পরিবর্তন তার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আজ প্রজননের সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গও সমান গুরুত্বের। এর প্রয়োজন আজ মূলত তাই ব্যবহারিক প্রয়োগে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উন্নত প্রজনে যার ফলে ফসলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, পশুপালন সর্বাধিক লাভজনক হয়, আর মানুষের সুপ্রজননে যাতে শিশুরা স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, তাদের ক্রমবিকাশ উন্নত হয় ও পারিবারিক জীবন অর্থাৎ সমাজ জীবনও সুপরিকল্পিত থাকে। প্রজনন এখন জন্মের আগের দশ মাসে মানব শিশু কীভাবে বেড়ে ওঠে তা জানতে পেরেছে যার বর্ণনা খুবই আগ্রহের—প্রথম মাস ঃ অজ্ঞাত অবস্থা থেকে মানব ভ্রূণের আকার, দ্বিতীয় ঃ মুখের গঠন, তৃতীয় ঃ লিঙ্গ নির্ধারণ, চতুর্থ ঃ গর্ভের অভ্যন্তরে দ্রুত বিকাশ, পঞ্চম ঃ চুল, নখ,

চামড়া, ষষ্ঠ: চোখ, সপ্তম: মস্তিষ্কের উদ্ভব, অষ্টম: জৈব তুলির শেষ টান, নবম: দৈহিক রূপের প্রলেপ, দশম মাস: জন্ম।

অভিব্যক্তিবাদ-ডারউইন: উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিষয়ে বিচিত্র ও অজস্র যে তথ্য জানা গেল তাদের সুগ্রথিত করে এক সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ধারণার মধ্যে নিয়ে আসা দরকারি মনে হচ্ছিল। এই প্রয়োজন মেটাতে এলেন ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। সভ্যতা ও জীবের ক্রমবিকাশ যে আকস্মিক দৈবক্রিয়া নয়, সুদীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী ও শেষপর্যন্ত মানুষের জন্ম সম্ভব হয়েছে, তাঁর প্রজাতির উদ্ভব ও মানুষের উদ্ভব গ্রন্থ দুটিতে তার সন্দেহাতীত প্রমাণ মিলল। বিবর্তনের তত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদের প্রথম যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বোঝা গেল কোন জীবের উদ্ভবই বিচ্ছিন্ন উপায়ে বা স্বাধীনভাবে হয় নি, হতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সংগ্রামে জীবদের বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয় ও প্রকৃতি যাদেরকে নির্বাচন করে সেই সব প্রাণীর সেই সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিই ক্রমবিকশিত হয়, যে প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংক্রিয়। এইভাবে দূর অতীতে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই গোত্রের প্রাণী, অভিব্যক্তিবাদ অনুসরণে তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একদিকে নানা জাতের মানুষ, অন্যদিকে নানা জাতের বানর। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মানব-জীবাশ্ম এর স্বপক্ষে যুক্তি যুগিয়েছে, আজও যোগাচ্ছে। ক্রমবিকাশের অসংখ্য সংযোগসূত্রের কিছু কিছু হয়ত এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে কিন্তু মূল প্রতীতির রূপকল্প নির্মাণে কোন খামতি নেই, যার প্রমাণ সঙ্গের ছবিতে মিলবে। তার আগে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে হাক্স্লীর অনবদ্য সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে—Evolution can be defined as a natural process of transformation, self operating and irreversible, which in its course generates novelty, greater variety, more complex organization,

and eventually higher levels of mental or psychological activity. The process has three main sectors—inorganic or cosmic, organic or biological, human or psychosocial.

ক্রমবিকাশের চিত্র

এককোষী প্রাণী—(পর্যায়ক্রমে)→মাছের আদিপুরুষ→উভচর→

সরীসৃপ

↓

পাখির আদিপুরুষ ↓ | ডাইনোসর ↓

↓

স্তন্যপায়ী

↓

জলচর | স্থলচর | খেচর

↓

প্রাইমেট

↓

মানুষের আদিপুরুষ | বানর | বনমানুষ

↓

ড্রাইওপিতেক (১ থেকে ১½ কোটি বছর আগে)→অস্ট্রালোপিতেক (১০ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে)→পিতেকানত্রোপ (৫ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে)→নিয়নডার্থাল (১ থেকে ৫ লক্ষ বছর আগে)→উন্নত বুদ্ধির মানুষ (১০ থেকে ২০ হাজার বছর আগে)→আধুনিক মানুষ।

ডারউইনের তত্ত্বের প্রভাব দূরপ্রসারী হয়েছে। বিস্তৃত ও গভীর এই প্রভাব বিংশ শতাব্দীর রক্তের সাথে মিশে আছে, নিঃশ্বাসের বাতাসের মত অনিবার্য হয়ে।[৩১]

কোষতত্ত্ব : কোষতত্ত্ব বা বংশগতিবিদ্যার প্রারম্ভিক সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকে। এটা ঘটে বায়োমিতি, ও তাতে পরিসংখ্যানপ্রণালীর

প্রয়োগের ফলে, যা সঙ্করবর্ণ বিষয়ে প্রথম নির্দিষ্ট তথ্য যোগাল। বংশ-বিস্তার বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক ও বিস্তারিত ধারণার প্রবর্তক মেণ্ডেল। বংশবৃদ্ধি, উত্তরাধিকার এবং লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক ধারা-বাহিকতা ও পরিবেশগত পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যবহারিক পরীক্ষার তিনি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। এরই কাছাকাছি সময়ে দেহকে কোষের সমষ্টি বলে উল্লেখ করে বলা হয় সমস্ত কোষ একটি আদিকোষ থেকে উদ্ভূত, ডিম্বকোষ বা শুক্রকোষ। এরপর এল জিন সজ্ঘটন বিষয়ে হার্ডির প্রসিদ্ধ উপপাদ্য, পরিব্যক্তির ধারণা ও ক্রোমোসোমের আবিষ্কার। জননকোষের বিভিন্ন প্রসঙ্গ—নিষেক, গুণনের মধ্য দিয়ে কোষগুলির কোষোত্তর এক পর্যায় পাওয়া, কোষবিভাজন ও কোষের বিকাশ এবং কোষোত্তর অবস্থার—কলা ও মৌল অঙ্গের—বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের এই শাখাকে সংহত করল। জিন ও ক্রোমোসোমের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন মরগ্যান। মেণ্ডেলের জিনতত্ত্বের সাহায্যে ডারউইনের অভিব্যক্তিকে পরিবর্ধিত করা হল। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও পরিব্যক্তি দুটিই অভিব্যক্তির পক্ষে জরুরি হয়ে উঠল।

জীবকোষের মধ্যে অবস্থিত বংশগতি নিয়ামক বস্তুটির নাম জিন। জীবকোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমো-সোম। সেই ক্রোমোসোম তৈরি হয় একধরনের জটিল রাসায়নিক অণু ডি. এন. এ. দিয়ে। জীবজগতের বংশগতি সংবহনের দায়িত্ব ডি. এন. এ. বা তারই ছাঁচে তৈরি তার এক বিশেষ দূত আর. এন. এ-র। এই অম্লধর্মী যৌগিক পদার্থ ডি. এন. এ-র ডাকনাম জিন। ক্রমে এর রাসায়নিক গঠনবৈচিত্র্য আবিষ্কৃত হল, বোঝা গেল কোষ বিভাজনের সময় কী করে একটি ডি. এন. এ. থেকে দুটি প্রতিরূপ ডি. এন. এ. তৈরি হয়। জীবদেহে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এন-জাইমের সহায়তায়। এনজাইমের পরিমাণ, কর্মধারা ও সজ্জাক্রম নির্ধারণ করে ওই ডি. এন. এ.। আজ কৃত্রিম উপায়ে ডি. এন. এ. প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। তার গঠনজনিত ত্রুটি দূর করা ও কৃত্রিম উপায়ে তার বিবিধ পরিবর্তন সাধন করার জন্য জেনেটিক

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উদ্ভব হয়েছে যার তাত্ত্বিক সম্ভাবনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সুফল দূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

সামাজিক প্রভাব-পরিবেশ ও জীববিদ্যা : বিভিন্ন জৈব প্রতীতিকে কেন্দ্র করেই জীববিদ্যার বিকাশ। এর বিস্তার এখন এত ব্যাপক হয়েছে যে একজনের পক্ষে সমগ্র জীববিদ্যার একটা খণ্ডাংশই আয়ত্ত করা সম্ভব। বাইরে থেকে দেখলে একে কিছুটা অগোছালো মনে হতে পারে। জীববিদ্যায় ধারণা মিলছে আমার নিজের শরীরের গঠন ও কর্মধারা সম্পর্কে, ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ছাড়াও এর প্রতি একটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকে। খাদ্য ও পুষ্টি, ওষুধ ও জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ও জৈবশিল্প, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক—যে কোন বিচারেই জীববিদ্যার প্রভাব অপরিসীম ও প্রয়োজন অপরিহার্য। অর্থাৎ জৈব প্রতীতি বৃহত্তর তাৎপর্য পাচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা, প্রকৃতির সংরক্ষণ ও তাকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো এবং জনসমস্যার সমাধান, সর্বত্রই জীববিদ্যার প্রভাব কার্যকরী হয়, হতে পারে। যে সব গ্রন্থি হরমোন উৎপাদন করে তাদের কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, কোষের বিপাক, অপচিতি ও উপচিতি বিষয়ে জ্ঞানকে আহত অঙ্গের প্রতিস্থাপনের কাজে লাগিয়ে, আর প্রাণরসায়নের প্রধান আবিষ্কারগুলিকে জীববিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বে অনুবাদিত করে এই প্রভাব আরও দূরপ্রসারী হয়ে উঠবে, বিংশ শতকের শেষভাগে এখন এই আশা রাখা যায়।

ভূবিজ্ঞান

ভূতত্ত্ব : জিয়োলজির অনুশীলনের বিষয় হল, সংক্ষেপে বলতে গেলে, পৃথিবীর ইতিহাস। উনিশ শতককে এই শাখার স্বর্ণযুগ বলে উল্লেখ করা হয়। যে সময়ে বহু অভিযান চালিয়ে ও উপযুক্ত মানচিত্র এঁকে ; স্মিথ, Cuvier, Brongniart-এর আবিষ্কারে ও Lyell, Darwin, Suess-এর রচনায় ; আর জীব-অভিব্যক্তি ও সর্বত্র সর্বকালে বিভিন্ন

অংশে সমতা—এই দুই সর্বতোভিন্ন প্রতীতির উদ্ভাবনে ভূতত্ত্বের প্রধান তত্ত্বগুলি রূপ পেতে শুরু করে। ভূ-ত্বক বিষয়ে জ্ঞান, খনিজ সংস্থানের অনুসন্ধানে ভূবিদ্যার প্রয়োগ, স্তরীভূত শিলা থেকে জীবাশ্মের আনুপাঙ্খিক ও নিয়মানুগ সংগ্রহ (Rowe উল্লেখ্য), জীববিজ্ঞানীদের অভিব্যক্তির ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করার জন্য এইসব জীবাশ্মের জৈব বিশ্লেষণ, পুরাভৌগলিক অবস্থার অনুশীলন, পৃথিবীর আদি ইতিহাস ও ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গঠন—এগুলি ছিল উনিশ শতকের মূল অবদান। ভূতত্ত্বের প্রাথমিক বিষয় হল বিভিন্ন ধরনের শিলা—পালল শিলা, আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলার এবং যে সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা গড়ে উঠেছে ও বর্তমান রূপ পেয়েছে তার অনুশীলন। স্বভাবতই শিলা ও লাভার প্রকারভেদ ও তাদের শ্রেণীকরণও এর অন্তর্ভুক্ত, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, কাজগুলি করে ওঠে। এর জন্য শিলাতত্ত্ব নামে একটি ভিন্ন শাখারও সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক কাজের পর আর যে সব বিষয় তার দায়িত্বের অন্তর্গত তাদের একটি হল পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। ভূ-কম্পলিক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা এই বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে। এখন জানা গেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের ঘনত্ব গভীরতা অনুযায়ী ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে ও তার অঙ্গস্তরগুলির বিন্যাস একটা এককেন্দ্রী খোলকের মত। বলয়িত অনুবন্ধনের সূত্র পৃথিবীর অন্তর্গঠন ব্যাখ্যার কাজে সাহায্য করছে। মহাদেশ ও মহাসাগর সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে হয়ত মহাদেশগুলি এক সময়ে গায়ে গা লাগিয়ে একসঙ্গেই ছিল (Wegner দ্রষ্টব্য) আর জল ও স্থলের মধ্যে যে প্রাচীন স্থানবিনিময়ের কথা বলা হয় তা বহু দূর অতীত পর্যন্ত মহাদেশের মোটামুটি প্রান্ত বরাবর সীমাবদ্ধ ছিল বলেই মনে হয়। একাধিক মহাসাগরের দুই পাড়ের শিলা ও জীবাশ্মের পাঠোদ্ধার স্থলজ উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূলের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য নির্দেশ করে যা ভূতত্ত্বের বিবিধ সমাপতনের একটি। পৃথিবীকে বর্তমান অবস্থায় আসার জন্য যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে

হয়েছে তাতে কত সময় লেগেছে, অর্থাৎ সহজ করে বললে পৃথিবীর বয়স কত তাও ভূতত্ত্বের বিবেচ্য। ভূতত্ত্বের একটি নিজস্ব সময়ের-মাপ আছে। তাতে বৃহত্তম সময়সীমাকে era, একে যে শ্রেণীতে বিভাজিত করা হয় তাকে period, period-কে যাতে বিভাজিত করা হয় তাকে epoch এবং epoch-কে যে ক্ষুদ্রতম এককে বিভক্ত করা হয় তাকে age বলে। পদার্থবিজ্ঞানের তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে এই কাল নিরূপণের কাজ এখন অনেক সহজ হয়েছে। গণনা করে জানা গেছে সবচেয়ে প্রাচীন যে সব শিলার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের বয়স ৫০০ কোটি বছরেরও বেশি। আর সব চাইতে পুরনো যে জীবাশ্ম আমাদের সংগ্রহে আছে তা ৫০ কোটি বছর আগেকার (হোমস উল্লেখ্য)। মোটামুটি ওই সময় নাগাদ পৃথিবীতে প্রথম আদিম উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে, প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে ক্রমবিবর্তনের ফলে যে উদ্ভিদ তার আদিমতা অনেকটা ঝেড়ে ফেলে আজ থেকে ৪০ কোটি বছর আগে। আদিতম উদ্ভিদ ও আদিতম প্রাণী দুইই জলজ বা জলচর। আদিতম প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল আদিম উদ্ভিদের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে। স্থলচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল এর প্রায় ১৫ কোটি বছর পর, যখন স্থলজ উদ্ভিদের দর্শন মিলল। আনুমানিক ৩৫ কোটি বছর আগে স্থলচর প্রাণী—পতঙ্গ, মাকড়শা, বিছা—প্রথম দেখা গেল। প্রয়োগগত ভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও শ্রেণীবদ্ধ আর প্রণালীবদ্ধ রীতির প্রচলনের ফলে তত্ত্বগতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ভূতত্ত্ব চলেছে নতুনতর অগ্রগতির দিকে।

খনিজবিদ্যা : ভূতত্ত্বের সমস্ত প্রসঙ্গ খনিজবিদ্যা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দাবি করে। আবার ভূবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ আজ কর্মসূত্রে খনিজ-সংস্থান অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত। এই শাখার উৎপত্তি হয়েছিল কেলাসীয় গঠন ও জ্যামিতিক কেলাসবিদ্যা থেকে। খনিজদ্রব্যের অবশ্য জ্যামিতিক বিমূর্তনের চেয়ে অধিক কিছু থাকে, তা হল বাস্তব ভৌত গঠন। এই বাস্তব গঠন বিষয়ে অনবচ্ছেদ ও সমসত্ত্বতার প্রসঙ্গ নিয়ে এক সময়ে খনিজবিদ্যায় আলোচনা হয়েছে,

উপাদান কণার মধ্যে দুই প্রকার মিথস্ক্রিয়া বর্তমান বলে অনুমান করা হয়েছিল—আসক্তি ও সংসক্তি। রঞ্জন-রশ্মির সহায়তায় খনিজদ্রব্যের সংগঠন পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হতে ওই অনুমানের আমূল সংস্কার সাধন করতে হয়েছে। এখন খনিজ পদার্থের দৃক্‌গত ধর্ম, ভৌত ধর্ম, রাসায়নিক ধর্ম ও প্রাকৃতিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত অনুশীলন হয়। দৃক্‌গত ধর্ম বলতে দ্বৈত প্রতিসরণ, ঘূর্ণ-সমাবর্তন, তাপের সঙ্গে দৃক্‌গত ধর্মের সম্পর্ক, দৃক্‌গত ব্যত্যয় ও অন্যান্য। ভৌত ধর্মের মধ্যে পড়ে ঘনত্ব, কাঠিন্য, প্রসারণ, পরিবাহিতা, মেরুবিভেদ, চুম্বকত্ব, তিরশ্চুম্বকতা ও কেলাসীয় বৃদ্ধি ইত্যাদি। যে দ্রবণ থেকে কেলাস গঠিত হচ্ছে তার প্রকৃতির উপর কেলাসের আকার কীভাবে নির্ভর করে, সমাকারতা, বহুরূপতা, দ্বিরূপতা, সদৃশরূপতা ও খনিজদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি রাসায়নিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। খনিজদ্রব্যের উৎপত্তি, গঠন, শ্রেণীভেদ, শ্রেণীকরণ ও পরিবর্তনের আলোচনা প্রাকৃতিক প্রসঙ্গে আসে। বিশেষত রূপান্তর অর্থাৎ তাদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জল ও আগুনের; ফলে তাপ, চাপ, পীড়ন ও রাসায়নিকভাবে সক্রিয় তরলেরও; ভূমিকা। উল্কা সংক্রান্ত অধ্যয়ন খনিজবিদ্যার আর এক দিক। উল্কার গঠন ও সংবিধান সম্পর্কে তথ্য মহাজগতের ইতিহাস ও পৃথিবীর ইতিহাস বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করে। খনিজবিদ্যার মূল প্রয়োজন এখন প্রাযুক্তিক। আজ গলন, ঊর্ধ্বপাতন ও দ্রবণ-প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে খনিজদ্রব্য ও আগ্নেয় শিলা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও অন্য জ্বালানীর উদ্দেশে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে ও যে তথ্য আহৃত হচ্ছে তা ভূতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করছে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এমনকি সমুদ্রের ভিতর অতিগভীর রন্ধ্রন, জ্বালানী ও বিকল্প শক্তি সন্ধানে যা অপরিহার্য, ভূতত্ত্বকে আজ জলের নিচে দৃষ্টি দিতে উৎসাহ ও সামর্থ দিয়েছে।

ভূগোল : ভূগোলের সেই অংশটুকু সম্পর্কে আমরা আগ্রহী যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও সব ধরনের

অধিবাসী মানবিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে। আমরা উল্লেখ করব প্রথমে, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গণনাভিত্তিক ভৌগলিক মানচিত্রগুলির কথা। তারপর ভূগোলের একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা তৈরির কথা। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে ভৌগলিক জ্ঞান এখন শুধু স্থলভূমিতে আর আবদ্ধ হয়ে নেই, সমুদ্র শাসিত এলাকাতেও বিস্তৃত হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে ভূঅঙ্গ-সংস্থান নামে নতুন শাখার। পৃথিবীর ভৌত ধর্মসমূহ—অভিকর্ষ, চুম্বকত্ব, তাপবৃদ্ধি বা তাপক্ষয়, বিদ্যুৎ-পরিবহনের ক্ষমতা, ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রেরণ—পরিমাপ করা হচ্ছে। এই কাজে সাহায্যের জন্য তৈরি হয়েছে ভূপদার্থবিজ্ঞান। ভূরসায়নের কথা তো আগেই বলেছি। ভূগোলের বিভিন্ন অনুষঙ্গের বৈজ্ঞানিক তদন্তের জন্য পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে—রাসায়নিক, মহাকর্ষীয়, চৌম্বক, বৈদ্যুতিক ও ভূকম্পীয়। এর মধ্যে ভূকম্পীয় পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রদ বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভূগোলের গবেষণা করা হচ্ছে বিমান, ডুবোজাহাজ ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিয়ে, সমুদ্রের মধ্যে টানেল খুঁড়ে কিম্বা শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে। এটা প্রাযুক্তিক দিক। আর সাংস্কৃতিক দিকে ভূগোল আজ হাত ধরে আছে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের। সে কথায় পরে আসছি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আজ বিজ্ঞানের একাধিক শাখা থেকে কিছুতেই আর বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ড. হকস্লে লিখছেন, 'medicine now derives knowledge from other subjects with increasing frequency as knowledge itself enlarges. Medicine may be thought of as the application of general knowledge to the betterment of the health of mankind……(moreover), medicine is endowed

with moral and philosophical problems which are not to be evaded when questions of advance in knowledge come up for discussion.' এই বৈশিষ্ট্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ও মূল্যায়নকে জটিল করেছে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এই নিশ্চয়তাও দিয়েছে। ওই উন্নতির গতি কোন্ অভিমুখে, তার সামগ্রিক প্রভাব কতটা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা কোন্খানে, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের নৈতিক সংকট উপস্থিত কিনা তা নিয়েও আলোচনা হওয়া জরুরি যে প্রসঙ্গ আসবে সোশ্যাল মেডিসিন (জনস্বাস্থ্য) পর্যায়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্গত শরীরতত্ত্ব, শারীরস্থান ও জীবাণুবিদ্যার প্রাথমিক আলোচনা আগেই করেছি। এখানে বলব প্রধানত ফলিত চিকিৎসাবিজ্ঞান—রোগ নির্ধারণ ও রোগ-নিরাময়-পদ্ধতি—এবং ভেষজবিদ্যার কথা।

ফলিত চিকিৎসাবিজ্ঞান: উনিশ শতকে যাঁদের প্রচেষ্টায় চিকিৎসাশাস্ত্র প্রথম প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তিবাদী হতে শুরু করল এবং ফলে বৈজ্ঞানিক প্রসার পেল তাঁরা হলেন Cabanis, Pinel, Bayle, Corvisart, Itard, Bright, Virchow, Charcot প্রমুখ। তাপমাপক যন্ত্র, স্টেথোসকোপ, প্রতিষেধক টীকা ও চেতনানাশকের প্রচলন হল, উন্নতি এল দন্তচিকিৎসা, অস্থিবিজ্ঞান, মনোরোগের চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ও অন্যান্য বহু শাখায়। যক্ষারোগ, যৌনরোগ, চোখের অসুখ, আলসার ও রক্তের অসুখের চিকিৎসা করা সম্ভব হল। আইন ও তদন্তের কাজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটল। হৃদ্পিণ্ডের ও মূত্রাশয়ের রোগ ও অপুষ্টিজনিত অসুখ সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হল। অ্যাপেনডিসাইটিসের আবিষ্কার এবং Serodiagnosis, Lumbar puncture ও রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রচলন হল। যে সব গ্রন্থি হরমোন উৎপাদন করে তাদের সম্পর্কে নানান্ তথ্য জানা গেল, খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত ব্যাধি, বিপাকীয় অভাব ও ত্রুটিজনিত ব্যাধি, ও বহু প্রকার ভাইরাস-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিভিন্ন অসুখ সম্বন্ধে অনুশীলন ও আবিষ্কার,

শিশুরোগ ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন, ল্যাবরেটোরি ও নার্সিং পদ্ধতির উন্নয়ন, হাসপাতালের সংখ্যাবৃদ্ধি ও রোগ নিরাময়ের পরেও পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সুযোগ আজ মৃত্যুহার কমিয়েছে, গড় আয়ু বাড়িয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতির একটি দিক বৈজ্ঞানিক, অন্যটি মানবিক। তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে এখনও প্রায় বঞ্চিত আর চিকিৎসাপদ্ধতিও পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমেই দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠছে, এই মানবিক ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা যাবে কীভাবে!

ভেষজবিদ্যা : উনিশ শতকে রসায়নের অগ্রগতি ভেষজবিদ্যায় দ্রুত পরিবর্তন আনল। বহু নতুন ওষুধ ও তার চেয়ে বড় কথা, ওষুধ তৈরির সম্পূর্ণ নতুন প্রণালী আবিষ্কৃত হল। প্রাচীন মতবাদ থেকে সরে এসে এইসব নতুন ওষুধ ব্যবহার করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে লাগল চিকিৎসকদের মধ্যে। পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্ব এরপর ভেষজবিদ্যায় আমূল রূপান্তর ঘটাল। এরই সঙ্গে এল ধনুষ্টংকার, প্লেগ, ডিফ্‌থেরিয়া ও অন্যান্য মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক সিরাম। ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন, কুরি দম্পতি আবিষ্কৃত রেডিয়মের রেডিয়ম রশ্মি হিশেবে ক্যানসার ও বিভিন্ন রোগে ব্যাপক প্রয়োগ ঘটবে অবশ্য বিশ শতক থেকে। পেনিসিলিন, সালভারসান, সালফোনামাইড, ইনসুলিন, মাইসিন ও মাইসিটিন গোষ্ঠী, টকসিন ও ফেনিকোল গোষ্ঠী এবং অন্যান্য অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ ভেষজবিদ্যায় বিপ্লব এনে দিল। টিশু বৃদ্ধির ত্রুটি জনিত রোগ অর্থাৎ ক্যান্‌সার গোত্রের অসুখ ছাড়া আর সমস্ত রোগের ওষুধই, বলতে গেলে, এখন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এমনকি মনোরোগের চিকিৎসায়, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক পদ্ধতির বাইরেও, উপযুক্ত ওষুধের সাহায্যে এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চলেছে। প্রাণরসায়নশিল্পের একটি বড় অংশ আজ ভেষজশিল্পের দখলে।

শল্যবিদ্যা : অস্থিভঙ্গে, অঙ্গচ্ছেদে, ছিন্ন পেশীর সংস্থাপনে, হার্নিয়ায় ও প্রসবে, অস্থিসন্ধি ও পাকাশয়ে শল্যাস্ত্র প্রয়োগ;

চেতনানাশক ও জীবাণুনাশক দ্রব্যের ব্যবহার; আর শল্যাস্ত্রের ক্ষেত্রে কারিগরী উন্নতি শল্যবিদ্যার সূচনা করল। উনিশ শতকের শেষাশেষি অন্ত্রের রোগে ও হৃদপিণ্ডের ক্ষত সেলাই করার কাজে শল্যের প্রয়োগ ঘটল। এরই পাশাপাশি মানব-শরীরতত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞানের পর্যাপ্ত উন্নতি হতে শল্য প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল। শল্যচিকিৎসার প্রকৃত ও অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধি ঘটেছে অবশ্য বিগত পঞ্চাশ বছরে। এই চিকিৎসা আজ আর রোগীর ওপর শল্যাস্ত্র প্রয়োগের মত সাদামাটা কিছু নয়, রোগ নির্ধারণ, গবেষণা, কৃত্রিম অঙ্গের স্থাপন, হৃদ্‌পিণ্ডের সংস্থাপন, ব্রেনের আঘাতের নিরাময়—বিচিত্র ও বিবিধ ক্ষেত্রে এখন এর প্রয়োগ। ভেষজবিদ্যার সমৃদ্ধি ও অস্ত্রোপচারের সময় শরীরে রক্ত প্রেরণ করার পদ্ধতির উন্নতি—এই দুই কারণে আজ এর ব্যবহার ও সাফল্য এত বিস্তৃত হয়েছে। এ ছাড়া শল্যচিকিৎসা আজ বিশেষজ্ঞ-ভিত্তিক, অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গের জন্য বিশেষ চিকিৎসক-ভিত্তিক হয়ে ওঠায় খুব সূক্ষ্ম ও জটিল ক্ষেত্রেও অস্ত্রোপচার সম্ভব হচ্ছে। এই কাজে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক টিভি পর্দা ও কম্‌পিউটার।

জনস্বাস্থ্য ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের, নগরের, রাজ্যের বা দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধ্যয়নকে বলা যায় জনস্বাস্থ্য। ইউনিসেফের ঘোষণায় বলা হচ্ছে, it is the study of environment in relation to health and disease, an attempt to widen the field of medical science by a shift of emphasis from the individual to the community. যে সব সামাজিক উপাদানের ওপর জনস্বাস্থ্য নির্ভরশীল সেগুলি হল খাদ্যপুষ্টি, জল সরবরাহ, গৃহসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থা, উপার্জন ও বণ্টন পদ্ধতি, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক / অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজ কাঠামো। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সম্পদ বণ্টন, কর্ম সংস্থান, প্রযুক্তি কৌশলের ব্যবহার ও এর সহজলভ্যতা নির্ভর করে

দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনা, তার বাস্তব রূপায়ণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিক চিত্রটি খতিয়ে দেখার কাজে পরিসংখ্যানের সঙ্গে এর সম্পর্ক (প্রারম্ভিক কর্মীদের মধ্যে ড. স্নো উল্লেখ্য) প্রত্যক্ষ। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে এখন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে ভাবা হচ্ছে—দারিদ্র / অপুষ্টি / শিশুমৃত্যু, অশিক্ষা / অবক্ষয় / যৌনরোগ, ভারসাম্যহীন উন্নয়ন / জনসংখ্যা সমস্যা / জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ[৩২] ইত্যাদি। হাসপাতালে রোগ ও রোগীর তত্ত্বাবধানের ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, দীর্ঘমেয়াদী রোগভোগের পর রোগমুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দান এবং বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত শিল্প-বা শ্রমিক স্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্যের বিবিধ দিক। গত কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক একদিকে আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তাঁরা মেকি চাহিদা বাড়িয়ে অনর্থক জোর দেওয়া শুরু করেছেন দামী দামী ওষুধ, টনিক ও খাদ্যদ্রব্যের প্রতি। বলা হচ্ছে, চিকিৎসকরা বৃহৎশিল্পের তাগিদে এগুলোকে দরিদ্র মানুষের তথাকথিত প্রয়োজন বলে খাড়া করছেন। সব মিলিয়ে চিকিৎসা হয়ে উঠছে দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ ও মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ। আবার ধনবান সম্প্রদায় চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের কাছ থেকে সর্বদাই নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নতুনতর পদ্ধতি, সর্বাধুনিক সিদ্ধান্ত—হোক না তা যতই অপ্রাসঙ্গিক, দাবী ও আশা করছেন। ফলে চিকিৎসার গিমিক, সংখ্যায় ও পরিমাণে, বেড়েই চলছে। জনস্বাস্থ্যকে আজ এই নৈতিক সমস্যারও সম্মুখীন হতে হবে।

কারিগরী বিজ্ঞান

দেখিয়েছি, এক এক সময়ে বিজ্ঞানের এক এক শাখা প্রাধান্য পায়, সেখানে উন্নতি হয় তড়িদ্‌গতিতে। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রাধান্য

কারিগরী বিজ্ঞানের, অর্থাৎ ইন্‌জিনিয়ারিং ও টেক্‌নোলজির। তার কারণ ও এই উন্নয়নের পরিচয় ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী পরিচ্ছেদে। ওটিই এ বইয়ের, এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ।

নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব

এই তিনটির প্রতিটি অন্য ছুটির মধ্যে এমনভাবে অনেকটা ডুবে গিয়ে কিছুটা জেগে আছে যে কোন্‌টির আগে পরে কোন্‌টিকে দেব এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতেই পারে। আমি এইভাবে সাজালাম।

নৃতত্ত্ব ঃ নৃতত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষের প্রকৃতি ও ইতিহাস। মানুষ কী করে বড় হল ও বেড়ে উঠল, কী তার আচার আচরণ, অভ্যাস ও প্রবণতা, সমাজ ও মনের কাঠামো, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা ও ক্রমপরিবর্তনশীলতা—সব। ভূমিকায় এ বিষয়ে বেশ কিছু বলেছি। এখন সেই প্রসঙ্গে ফিরে এসে নতুন এই বলার যে, প্রসঙ্গগতভাবে নৃতত্ত্ব হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজ, এবং সামাজিক সংস্কৃতির অনুশীলন, পদ্ধতিগতভাবে তা ছুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে—রীতিনীতি (কাস্‌টম) ও সমাজ কাঠামো (ভূমি বণ্টন ও অর্থনৈতিক কাঠামো, শ্রেণী সংগঠন ও রাজনীতি / আইনের ব্যবস্থা পদ্ধতি)। রীতিনীতি ও সমাজ কাঠামো, উভয়েরই পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা হয় ব্যক্তি-সমূহের বিভিন্ন আচরণের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তা সমাজবদ্ধ যৌথ জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকেই সমৃদ্ধ করে, কেননা সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে সেই সমস্ত নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা থেকে যা কোন্ একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ কাঠামো ও রীতিনীতি তাই মানুষের উদ্দেশ্য-পূরণ ও প্রয়োজন-নিবৃত্তির ছুটি সামাজিক পদ্ধতি। এইভাবে সামাজিক নৃতত্ত্ব একদিকে সমাজতত্ত্ব ও অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর অনুশীলনের জন্য সাধারণত আদিম ও উপজাতি সমাজ বেছে নেওয়া হয়, কিন্তু

সমস্ত মানুষ যেমন ভৌতভাবে একই প্রজাতির, তেমনি বিভিন্ন মানবসমাজও একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ বলে, যে সমাজ-ব্যবস্থারই অধ্যয়ন করা হোক না কেন তা কোন না কোনভাবে সমগ্র মানবসমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য। মানবমনের প্রাথমিক চরিত্র সর্বত্র মূলত এক, এও স্বীকার করা হয়। এই দুই কারণে সংস্কৃতির বিজ্ঞান সম্ভবপর[৩৩] (টাইলর ও মরগ্যান পথপ্রদর্শক)। আর যথাস্থানে গিয়ে প্রণালীবদ্ধ সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ নিজে চালানোই যে নৃতত্ত্বের পক্ষে সংগত কারণে অপরিহার্য তার প্রমাণ দিয়েছিলেন Boas। এইভাবে উদ্ভব হয় এথ্‌নোলজির। তখন তুলনামূলক পর্যালোচনা শুরু হয় (Durkheim উল্লেখ্য)। বিশ শতকে অবশ্য সহজ তুলনামূলক আলোচনার বদলে বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রাধান্য দেখা গেছে। যার ফলে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুইভাবেই নৃতত্ত্ব এখন ক্রমবর্দ্ধমান। সমস্যার নির্দিষ্ট বর্ণনা, তথ্যের অণুবন্ধী সংগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীকরণ—তিন অবদানই সাম্প্রতিক। এরই সঙ্গে আপেক্ষিক নৃতত্ত্বের প্রচলন হয়েছে যে প্রতিটি রীতি ও প্রতিষ্ঠানেরই সার্বিক সমাজ-কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট আপেক্ষিক মূল্য আছে। নৃতত্ত্বের জ্ঞানকে অবলুপ্ত সমাজের বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সঙ্গে ও প্রাচীন সমাজের ওপর রচিত ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে মানবসমাজ কাঠামোর ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন আরও বৃহত্তর পটভূমির প্রেক্ষাপটে বুঝে ওঠা যায়।

সমাজতত্ত্ব ঃ সমাজসংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানকে দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক। প্রথম ভাগে পড়ছে পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব। দ্বিতীয়টিতে পড়ছে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, ও মনস্তত্ত্বের অনেকটা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে এই সমস্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজতত্ত্বও এই কারণে মূলগতভাবে আলাদা যে এরা মূল্য বিচার করে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উভয়ার্থে। সমাজতত্ত্ব মানব-সমাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে থাকে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত আবিষ্কার করেছে তা প্রকৃতিকে

নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে সমাজের জন্য একটি নতুন বিজ্ঞানের দরকার কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, মানুষ সমাজের এক বড় অংশ তাই সমাজকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনেই সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব। যে কোন সমাজবিজ্ঞান দু ধরনের হতে পারে, বুর্জোয়া মতবাদ প্রভাবিত ও মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে বলা হচ্ছে, whereas the natural sciences are primarily concerned with the productive forces of society, the social sciences deal with productive relations and the ideological super structure built to maintain and justify them. সমাজতত্ত্ব তাই মানবসমাজকে আরও বেশি বুঝে ওঠার চেষ্টা। মার্কসীয় ভাষায়, সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের প্রকৃতিকে, যা মূলগতভাবে দ্বান্দ্বিক প্রকৃতির, বুঝে ওঠা। সামাজিক তত্ত্ব ও গবেষণা, জননীতি, বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট সামাজিক সমীক্ষা, পণ্য সমীক্ষা, গণমত, ব্যক্তি-আচরণ ও তার সামাজিক বিধি, আইন ও সুবিচার, সামাজিক চলমানতা, রাজনৈতিক ঘটনাধারার সমাজতাত্ত্বিক বিচার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব প্রযুক্ত হয়েছে, অবশ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে দেশ থেকে দেশে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। মার্কস অর্থনীতির মাটিতে সমাজের শিকড় কীভাবে বাঁধা পড়েছে দেখিয়ে শ্রেণীগতিবিদ্যা গড়ে তুলেছেন। পদ্ধতিগত ভাবে সমাজতত্ত্ব তিনটে পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছে, বর্ণনাত্মক জৈব ও গাণিতিক (পরিসংখ্যান সহ), যদিও কোনটিই সম্পূর্ণতা পায় নি এখনও। মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মত একে বর্ণনাত্মক পদ্ধতির ওপর বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। মানবিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাজতত্ত্বের কাজ, যে মিথস্ক্রিয়ার সামাজিক কম্পোনেণ্টকে নিয়ে কাজ করছে নৃতত্ত্ব। এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কম্পোনেণ্টটি হল মনস্তত্ত্বের বিষয়।

মনস্তত্ত্বঃ মনস্তত্ত্বের ঐতিহ্য বহু দিনের, যদিও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে সে গত একশো বছরের কিছু বেশি সময়ে। গ্রীক আমলে এর পরিচিতি ছিল মানসিক দর্শন রূপে। ক্রমে মনের অধ্যয়ন ও

মানসিক গঠনের বিজ্ঞান, এই দুই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে এসে আজ সে পরিচিত হয়েছে আচরণের বিজ্ঞান রূপে, যে আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে শুধু মন নয়, মানুষের জীবদেহ ও তার পরিবেশও। তাই মনস্তত্ত্বকে আজ বলা হচ্ছে কিছুটা জীববিজ্ঞান, কিছুটা সমাজবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান বাকিটা। ডারউইনের সিদ্ধান্তের এবং পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের যুগপৎ অনুশীলনের ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মনস্তত্ত্বের বিশেষ ও নির্দিষ্ট চর্চা শুরু হয়। সেই পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অবশ্যই নাম করতে হয় Wundt ও তাঁর প্রায়োগিক অন্তর্দর্শন, জেম্‌স্ ও তাঁর রচনা, ওয়াটসন ও তাঁর চেষ্টিতবাদ, ফ্রয়েড ও তাঁর মনোবিশ্লেষণ এবং য়ুং ও Kohler-এর। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত মনোবিজ্ঞানেও তত্ত্ব, অনুমিতি ও পরীক্ষার নির্দিষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আচরণের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় বর্ণনাত্মক প্রণালী ও পরীক্ষাসিদ্ধ প্রণালী দুয়েরই প্রয়োগ ঘটেছে। উদ্দীপক-কারণ, জীব-প্রতিবন্ধ এবং প্রতিক্রিয়া, এই তিন ভেদ্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ন মানবিক আচরণ ও অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা যোগাচ্ছে। এই ব্যাখ্যা ও তথ্যকে মাত্রিক, সুসম্বদ্ধ ও প্রয়োজনমত বিশ্লিষ্ট করার কাজে পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই আচরণ ও অভিজ্ঞতার বংশগতিগত, কোষগত ও শরীরতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের ও কারণের বিশ্লেষণের জন্য মনস্তত্ত্ব, আগেই বলেছি, জীববিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জড়িত প্রাণরসায়নের সঙ্গেও। দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ-অনুভূতির অনেকটাই জৈব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বেশ কিছুটা স্নায়ুতন্ত্র ও দেহের গঠন জনিত। তবু মানুষ নিজের ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য এই কটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়াও আরও কিছুর প্রয়োজন বোধ করে, যেমন, মনোযোগ, বেদন, চেতনা ও বুদ্ধি। এদের সহায়তায় মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ শুরু হয়, তাতে ক্রমিক অগ্রগতি আসে, আহৃত জ্ঞান সঞ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয় স্মৃতিশক্তির, ক্রমে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তির উদ্ভব ঘটে, তার ইমোশন-ঘটিত আচরণ হয়ে ওঠে উদ্দেশ্য ও প্রেষণামূলক। এই প্রেষণার এক

অংশ সহজাত, আরেক অংশ সংগৃহীত, বাকিটা অচেতন বা অবচেতন। এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তারতম্য ও পার্থক্য থাকায় প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, রুচি ও স্বভাবে কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য ঘটেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ ও ভাব আর কাজের আদান প্রদান, ব্যক্তি-মানস ও ব্যক্তি-আচরণের সঙ্গে সমাজ-মানস ও সামাজিক আচরণকে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়া এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সার্বিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোকে গড়ে তোলা, সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব এইভাবে তার তৃতীয় যোগা-যোগটি স্থাপন করেছে। বিবিধ ও ব্যাপক যোগাযোগের ফলে আজ মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটছে চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প, কারিগরী, ক্রেতাস্বার্থ, মন্ত্রণা ও আইনের মত বিভিন্ন ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। এই বৈচিত্র্য প্রায়োগিক শাখা হিশেবে মনস্তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে।

যন্ত্রবিজ্ঞান (ইন্‌জিনিয়ারিং)

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি যন্ত্রের বিজয় যন্ত্রবিজ্ঞানের সূচনা করেছিল। শিল্পের ও বাণিজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী এতে ইন্ধন যোগায়। টারবাইন ও অন্তর্দাহ ইন্‌জিন, যন্ত্রপাতি ও ধাতুমাধ্যম, কয়লা ও লোহা এবং ইস্পাত যন্ত্রবিজ্ঞানের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। যোগাযোগ ও নৌপরিবহন ব্যবস্থা আর যুদ্ধ-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। রেল চলাচল শুরু হয়। এতদিন বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ছিল অনুসন্ধান সাপেক্ষ, উনিশ শতকে তা হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানীর মত যন্ত্রবিজ্ঞানীরাও একটা বৃত্তিগোষ্ঠী হয়ে পড়লেন। ক্রমে দেখা গেল যন্ত্রব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে যন্ত্র-বিজ্ঞানীরা সংখ্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীদের ছাড়িয়ে গেলেন। বিজ্ঞানীদের যন্ত্রবিজ্ঞানের কথা মাথায় রেখে গবেষণা চালানোর প্রয়োজন হল। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় যন্ত্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হল এইভাবে, The engineer's principal work is to discover and conserve natural resources of materials and forces, including the human, and to create means for utilizing these resources with minimal cost and waste and with maximum useful results. (greatest possible benefit অর্থে।) ১৭৫০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ব্রিটেনের যন্ত্র বা শিল্পবিপ্লব যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের জন্য সরাসরি দায়ী। যখন শিল্প কিছু কারিগরের বিশেষজ্ঞ সুলভ দক্ষতা থেকে পাইকারি হারে শ্রমিক নিযুক্ত করে চালিত উৎপাদনরীতিতে সরে এল। এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে

আলোচনা করব যন্ত্রবিপ্লবের অংশে।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি : পাইকারি হারে নিযুক্ত শ্রমিকভিত্তিক উৎপাদন থেকে বিশ শতকে আমরা এলাম স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনে। বাস্তুকৃত্য প্রণালীর আমূল সংস্কার; রাসায়নিক, জৈব ও প্রাণ-রাসায়নিক শিল্পের ও শক্তি রূপান্তর প্রণালীর প্রচলন; বৈদ্যুতিক বাল্ব ও বেতার, দূরভাষণ দূরদর্শন ও রাডার যন্ত্র, ইলেক্ট্রনিক ভাল্‌ভ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক শিল্পের সমৃদ্ধি; রেল ও মোটরগাড়ি; খাদ্য ও কৃষিবিপ্লব; জীবযন্ত্রবিজ্ঞান; উড়োজাহাজ, জেট বিমান, বায়ুগতিবিদ্যা, রকেট, মহাকাশ অভিযান ও চন্দ্রবিজয়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাফল্য ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের অসামান্য প্রমাণ। আজ ভারী জটিল ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যে যুগ চলছে তাকে দ্বিতীয় যন্ত্রবিপ্লব বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম যন্ত্র-বিপ্লবে মানুষের দৈহিক শ্রমের এক বড় অংশ যন্ত্রের দায়িত্বে চলে এল। দ্বিতীয় যন্ত্রবিপ্লবের ফলে কিছু কিছু মনন ও সিদ্ধান্তগত কাজকর্ম যা এতদিন মানুষের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় পরিচালিত হত তার ভারও চলে গেল যন্ত্রের হাতে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কম্প্যুটার। অবস্থার মাত্রাগত এমন রূপান্তর ঘটে গেল যে বিজ্ঞান ও শিল্পকে বাস্তবে তো নয়ই এমনকি আলোচনাতেও পরস্পরের থেকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ল। অগ্রগতি হচ্ছিল কত কম সময়ে অর্থাৎ কী দ্রুত গতিতে তা ছোট একটি উদাহরণে স্পষ্ট হবে—আলোকচিত্রের উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করতে হয়েছে ১১২ বছর ধরে, ১৭২৭ থেকে ১৮৩৯ পর্যন্ত; দূরভাষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য যেখানে প্রয়োজন হয়েছে ১৮২০ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত ৫৬ বছরের; বেতারের জন্য যখন ১৫ বছরের ১৯২৫ থেকে ১৯৪০; পরমাণু বোমার জন্য সেখানে ৬ বছরের, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫। যন্ত্রবিজ্ঞান হয়ে উঠল পুরোদস্তুর টেক্‌নোলজি বা প্রযুক্তিবিজ্ঞান। প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পূর্ণ উপযোগ নির্ভর ও এর কাজ হল যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা। বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করার সময়ে প্রযুক্তিবিজ্ঞানীরা

সময়, স্থান, কাঁচামাল, অর্থ ও শ্রমনীতির বিভিন্ন শর্ত ও সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখেন, আবার বিজ্ঞানকে কীভাবে আরও বেশি কার্যকরী করে কাজে লাগানো যায় তারও চেষ্টা করেন। তাই কলাকৌশলের 'জানো কীভাবে' ধারণা তাঁদের পক্ষে এখন আর যথেষ্ট নয়, দরকার হয় বিজ্ঞানভিত্তিক 'জানো কেন' ধারণারও।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সূচনা ও প্রাধান্য

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যে কোন ইতিহাস আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই বইয়ে এর আগে একাধিক বার দেখিয়েছি সভ্যতার ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে কীভাবে বার বার অগ্রগতি হয়েছে, এসেছে, বিজ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি কলাকৌশলজনিত কারণে। পরবর্তীকালে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান কলাকৌশলের মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে জন্ম দিয়েছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্ত্যে প্রযুক্তির একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, গ্রীক-রোমান সভ্যতায় যেটা ছিল না। অষ্টম থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত প্রাযুক্তিক অগ্রগতির ইতিহাসে অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় পাওয়া যায়, ১. আদিসামন্ততান্ত্রিকযুগ, অশ্বারোহণে পাদানির প্রচলন যে সময়ের সবচেয়ে কুশলী ও সুদূরপ্রসারী উদ্ভাবন ২. আদি মধ্যযুগের কৃষিবিপ্লব ৩. মধ্যযুগের শেষাংশে যন্ত্রের বহুল প্রয়োগ ও বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কার। তৃতীয় পর্যায়টি চূড়ান্ত পরিণতি পায় ব্রিটেনের যন্ত্রবিপ্লবে, যা ছিল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ কলকারখানা নির্ভর, অর্থাৎ যা নির্ভর করেছিল কয়লার, বা কয়লা-অনুসন্ধানের, বা ভূবিজ্ঞানের ওপর। এই নির্ভরতা বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ হওয়ায় আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রযুক্তিবিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। সভ্যতার ইতিহাস প্রকৃতির প্রাধান্য থেকে মানুষের অভিলাষের প্রাধান্যে চলে আসে, যে অভিলাষকে রূপ দেয় ও বাস্তবে সম্ভব করে তুলতে থাকে প্রযুক্তিবিজ্ঞান। শুধু যে মানুষের প্রাযুক্তিক

সাফল্যই এর ফলে বেড়ে যায় তাই নয়, সমাজ-কাঠামোতেও এই প্রভাবের দরুণ নানান্ রূপান্তর ঘটতে থাকে। প্রযুক্তিবিদ্যা ভৌত বস্তু ও বিষয় ও ভৌতশক্তি নিয়ে কাজ করে মানুষের পার্থিব প্রয়োজন মেটাবার এক নির্বন্ধ, ব্যাপ্ত, পূর্ণাঙ্গ ও অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত প্রয়াস শুরু করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রযুক্তির কাজে লাগানোর যে অভ্যাস দেখা দিল তার ফলে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন ঘটল, প্রযুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক হল, শুধুমাত্র প্রাযুক্তিক প্রয়োজনেই গবেষণায় হাত দেওয়া শুরু হল। গবেষণার প্রাযুক্তিক উপকার পেতে চাইল সকলেই। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান-গবেষণায় যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগ আসতে লাগল প্রযুক্তির খাত থেকে। প্রযুক্তি হয়ে উঠল অন্যতম পেশাদারী বৃত্তি।[৩৪] সি. পি. স্নোর মতে আধুনিক প্রযুক্তির বিচিত্র ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান বনাম মানবিক-বিদ্যার স্বীকৃত বিভাজন আজ পুরনো তাৎপর্য হারিয়ে ফেলছে।

যন্ত্রবিপ্লবে বিজ্ঞানের ভূমিকা

বিজ্ঞানের ইতিহাস বিচার ও মূল্যায়নের ইতিহাস। বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই শুধু কারণ নয়, যুক্তি নিয়েও কাজ করে। যুক্তি সংক্রান্ত ধারণায় যুক্তির স্বপক্ষে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বিজ্ঞানবিপ্লবে তার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। পরবর্তী বড় সাফল্য যন্ত্রবিপ্লব এক এক দেশে হয়েছে এক এক সময়ে। ব্রিটেনে ১৭৫০ থেকে ১৮৩০ খৃ. জুড়ে, আমেরিকায় এই বিপ্লব এসেছে ১৮৬১-৬৫র গৃহযুদ্ধের পর, জাপান ও রাশিয়ায় ১৯০০খৃ. র আগে নয়। যন্ত্রবিপ্লবের মাধ্যমে যে প্রাযুক্তিক উন্নতি ঘটল তা যে সভ্যতার অগ্রগতি, এই সিদ্ধান্ত বেকনের মনোভাব অনুসৃত। যন্ত্রবিপ্লবে বিজ্ঞানের সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। কারও মতে বিজ্ঞানের ভূমিকা এতে মুখ্য, কারও মতে আংশিক, কারও মতে নগণ্য—এদের ধারণা যন্ত্রবিপ্লবের সাফল্য এসেছে

পরিশ্রমসাপেক্ষ পরীক্ষামূলকতা থেকে, তা মূলত অভিজ্ঞতাজনিত। সব বিচার করলে বলা যেতে পারবে এই পরীক্ষামূলকতা ছিল যুক্তিবাদী, যুক্তিগ্রাহ্য, মাত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশযোগ্য ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। বিজ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা সহাবস্থান করত। এমনিতে ব্রিটেনে ওই সময়ে শিল্পে গবেষণার খুব একটা চল ছিল না। কেননা গবেষণার ফল ব্যাপক ষড়যন্ত্রের দরুণ আবিষ্কারক সংস্থায় আবদ্ধ না থেকে অচিরে অন্যান্য সংস্থার কাছেও প্রকাশ্য হয়ে পড়ত। ফলে কোন সংস্থাই গবেষণায় রীতিমাফিক উৎসাহ দেখায় নি, যে আবিষ্কার বা কৌশল আপনা থেকে এসে পড়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে, তাই-ই এসেছে। কেবল বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে যোগাযোগ-রক্ষাকারী বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষিত ও আগ্রহী একদল ব্যক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান মুক্ত, পরিবর্ধিত ও প্রয়োগযোগ্য হয়ে শিল্পে, শিল্পের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞ কিন্তু সাধারণভাবে দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে, ছড়িয়ে পড়ত। যথেষ্ট না বুঝে শ্রমিকরা তা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করত শিল্পের কাজে। ফলে বিজ্ঞান শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারকে উদ্দেশ্যগত ও কলাকৌশলগত-ভাবে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করত, তবে একটু পরোক্ষ-ভাবে। বলা যেতে পারে প্রভাবটি ছিল অর্থনীতির চাহিদার দিক থেকে যতটা, বিজ্ঞানের যোগানের দিক থেকে ততটা না।

যন্ত্রবিপ্লবের সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

যন্ত্রবিপ্লবের শুভ ও সদর্থক সামাজিক প্রভাব এই যে, জাড্য ঝেড়ে ফেলে সমাজ অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্তনের দিকে গেছিল, যেমন জীবনযাত্রার মানের সাধারণ উন্নয়ন, নগরীকরণ, দ্রুতহারে শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কাঠামোয় জমির গুরুত্ব হ্রাস আর দাসত্ব প্রথার বিলোপ। সমাজের প্রাযুক্তিক রূপান্তর একটি নির্দিষ্ট সীমা অবধি নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত। কেননা পূর্বোক্ত পরিবর্তন ছাড়াও কালক্রমে তা আরও দিয়েছিল সুদীর্ঘ আয়ুকাল,

বর্দ্ধিত অবকাশ, আরও বেশি সংখ্যক লোকের জন্য সাংস্কৃতিক সুবিধা, চাকুরিস্থলে উন্নততর অবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান সুযোগ। কিন্তু এই মাত্রিক উন্নয়ন সমাজকে গুণগতভাবে কতটা সমৃদ্ধ করেছে তাও ভাববার, ভাববার, প্রযুক্তির সুফল কতসংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে, অধিকাংশের কাছে কি? প্রযুক্তির সমাজতত্ত্বকে তাই রাজনীতি থেকে পৃথক করা যাবে না।

এটা অনস্বীকার্য যে শিল্পবিপ্লবের সুফল শিল্পপতি ও জনগণের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয় নি। শিল্প-করণের জন্য যে ব্যয় ঘটেছে তার এক অন্যায্য অংশ বহন করতে হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণকে। শ্রমিক-শোষণ, দ্রুত নগরীকরণের ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, বস্তি ও চোরাব্যবসার প্রসার, যন্ত্রচালিত শিল্পব্যবস্থার প্রচলনের ফলে অসংখ্য কুটিরশিল্পীর কর্মচ্যুতি (ও তাদের জন্য কোন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে না দেওয়া), অল্প মজুরি—সমস্তই এই অন্যায়ের প্রমাণ। শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে উন্নয়নমুখী হলেও পরবর্তী মন্দার নাগাল ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ব্যবসায়িক ব্যর্থতার বোঝা তাই শ্রমিকদের ঘাড়ে এসেই পড়ত। যন্ত্রবিপ্লবের এই রাজনৈতিক পটভূমিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রদ সাফল্য ছিল ১৮৪৮ খৃ. এ কম্যুনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার বা ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ। যে দ্বন্দ্ববাদ কম্যুনিজমের চালকশক্তি, সহজভাবে বোঝালে তা এই বলে যে, প্রতিটি প্রতীতি (থেসিস) সৃষ্টি করে অ্যান্টিথেসিসকে, এদের মিথস্ক্রিয়ায় একটি নতুনতর প্রতীতি (সিনথেসিস) সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী স্তরের ত্রিযোজীতে আবার থেসিস রূপে কাজ করে। সমাজের সঙ্গে প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণে এই দ্বান্দ্বিক মতবাদকে অস্বীকার করা যাবে না।

যন্ত্র সভ্যতার নেগেটিভিটি

যন্ত্র সভ্যতার নঞর্থকতার একাধিক প্রসঙ্গ সদ্য সমাপ্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। ব্যবহারিক বলে প্রযুক্তিবিজ্ঞান থেকে নঞর্থক প্রাপ্তির

সম্ভাবনা থাকেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণের সমস্যা,[৩৫] যুদ্ধের সময়ে ধ্বংস ও হত্যায় মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগ, মহাকাশ অভিযানে বিপুল অর্থব্যয় অর্থের নিতান্ত অপচয় কিনা এই বিতর্ক,[৩৬] প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যবোধের ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি আর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয় ওই নঞর্থকতাকে প্রসারিত করেছে। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সঙ্গে প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বলে হয়ত নঞর্থকতার কিছুটার জন্য প্রযুক্তি তত দায়ী নয় যতটা দায়ী পরিকল্পনা। এই ফাঁক থেকেই টেক্‌নোলজিক্যাল গ্যাপের উদ্ভব। প্রযুক্তি, অনেকের ধারণা, সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, তা দিতে পারে না বলে হতাশা থেকেও নঞর্থক ধারণা জন্ম নেয়। বাহুল্য ও যান্ত্রিকতা, উভয় বিচারেই প্রযুক্তি এতটা এগিয়ে গেছে যে মানুষ তার সঙ্গে নিজেকে সুষমভাবে মানিয়ে নিতে পারছে না, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে। এর অনেকটাই সমাজের পক্ষে সার্বিকভাবে মঙ্গলকর প্রযুক্তি-কল্পনার অভাবে। এই অনৈতিকতা, অপচয়, সামাজিক ক্ষতির হাত থেকে প্রযুক্তিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজের।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি-চিন্তা

রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজের, কেননা আধুনিক মানবের জীবনযাপন প্রণালী শিল্পসমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থার ফল। এই শিল্পসমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে মোটের ওপর বজায় রেখেই তার জীবনরীতি অব্যাহত রাখা যায়। মানুষ তার পার্থিব সমৃদ্ধি সম্বন্ধে যত আগ্রহী, এই সমাজকাঠামোর অসাম্য ও সংবেদনহীনতার সম্বন্ধে ততটা নয়। মাত্রাহীন শিল্পকরণের ফলে এই অসাম্য আসে, যার পরিণাম পরিবেশের বিরূপতা। এই বিরূপতা ও পূর্বোক্ত বিচ্ছিন্নতা প্রযুক্তির ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার দরুণ, যে পরিকল্পনা, মার্কসের ভাষায়, produces not only immense material wealth but also the universal alienation of man from the object, product and process of his

labour, of man from man, of man from society and of man from nature. ফলে এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রযুক্তির অপব্যবহার-জনিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি যতদূর সম্ভব কমিয়ে প্রযুক্তির সুফলকে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এভাবে ছাড়া শিল্পসমৃদ্ধ আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে সদর্থক করে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন সামাজিক পদ্ধতি নেই। প্রযুক্তিবিদরা যে কাজ করছেন তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিশেবে ধনতান্ত্রিক সমাজে আজ যা ঘটছে তার সবটার জন্য তাদের দায়ী করা যায় না, যেমন অসামান্য প্রাযুক্তিক সমৃদ্ধির জন্য প্রশংসাও সবটা তাদের পাওনা নয়, দুই-ই এক দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ। প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা ও কাজকর্মের ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের ততখানি নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক দেশে যা আছে। কেননা প্রযুক্তি সমাজের প্রয়োজনে, প্রযুক্তির ফলাফল ভোগ করতে হয় সমাজকেই, ফলে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তির ফলশ্রুতির দায়িত্ব-গ্রহণ—দুটি কাজই সমাজের হাতে থাকা উচিত। একমাত্র তাহলেই প্রযুক্তি একটা সামাজিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর যে নিয়ন্ত্রণ থাকবে তা নিছক সামাজিক (সোশ্যাল) না হয়ে হওয়া উচিত সোশিও-কাল্‌চারাল। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে শুধু বিজ্ঞানকে নয়, পৃথিবীকেই বাঁচিয়ে রাখতে গেলে দরকার হবে সর্বস্তরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার[৩৭]। বিজ্ঞান ও সভ্যতার ওই আন্তর্জাতিক প্রকৃতিকে বাস্তবে সম্ভাব্য করে তুলতে হলে জাতি থেকে জাতিতে যাবতীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ন্যূনতম সাংস্কৃতিক ঐক্যের দরকার হবে। আজ বিশ্ব জুড়ে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভেদ ও অসাম্য, আমি মনে করি, তার মূল কারণ সমাজ-কাঠামোর জন্য যেমন, তেমনই অন্য জাতির সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নাসিকতা ও কখনো কখনো বিজাতীয় বিদ্বেষের (জরমানির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার দৃষ্টান্ত মনে পড়বে) দরুণ। সুতরাং বিজ্ঞানের সোশিও-কাল্‌চারাল প্রসঙ্গ

জরুরি, যে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। সংস্কৃতিমনা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিহীন বিজ্ঞানের মধ্যে ততটা পার্থক্য মানুষ ও রোবটের মধ্যে যতটা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কৌশল থেকে সাংস্কৃতিক বিকিরণ সম্ভব যে বিকিরণের পরিমণ্ডলে পড়ে বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে গ্রীক বিজ্ঞান, চীনদেশের ঢালাই ব্রোঞ্জের তৈরি কারুকার্যময় শিল্পদ্রব্য, গ্যালিলিও নিউটন ও বিজ্ঞানবিপ্লব প্রভৃতি হয়ে আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত তার উদাহরণ ও ইঙ্গিত বারে বারে দিয়েছি। বিজ্ঞানে সূত্রের চেয়ে প্রতীতির মূল্য বেশি। তাই ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের চেতনা-সহ বিজ্ঞানের চর্চা হবে। তা বিজ্ঞানের দুর্নীতি ও অনৈতিকতা কমাতে পারবে অনেকটা। বলা হয়, মানুষ, মানুষ হয়ে উঠেছিল যখন সে নিজের প্রয়োজনকে খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রাথমিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে তার বুদ্ধি ও চেতনার ব্যবহারে বিস্তৃত করেছিল। সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল এইভাবে। আজ সভ্যতার হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এসে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের জন্য খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের ওই প্রাথমিক প্রয়োজনও মিটিয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের তৈরি বিজ্ঞান যদি তা না পেরে থাকে, আর পরিবর্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ও মানুষকে দিয়ে মানুষের শোষণ বাড়িয়ে থাকে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যেমন, তাহলে সেই বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের কী হবে ? বিজ্ঞানের পরিকল্পনায় জন-গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিচার-বিবেচনাকে মুখ্য মেনে নেওয়ার সময় এসেছে ! প্লাঙ্কের ভাষায়, আজ সবচেয়ে বড় বিপদ তাঁদের নিয়ে যাঁরা মানতে চান না যে যে-যুগ আজ শুরু হচ্ছে তার সঙ্গে অতীত বিগত যুগের একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য মেনে নেওয়ায় এবং তার প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞানের পরিকল্পনাকে সময়ানুবর্তী করে পরিবর্তিত করায় বিজ্ঞান ও মানুষ উভয়েরই সার্বিক মঙ্গল। তার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রসঙ্গ, বারান্তরে বলার।

পরিচায়িকা

(১) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / পৃথিবী ঘুরছে

(২) পুরাণের বাস্তবধর্মিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন B. Malinowski, Magic, Science and Religion গ্রন্থে। তিনি বলছেন, জীবনযাপন প্রণালীকে মীথ প্রভাবিত করছে ও সংঘটিত পরিবর্তন এবং আহৃত অভিজ্ঞতা মীথেরও নতুন সংস্করণ ঘটাচ্ছে ; দুইই বাস্তব প্রক্রিয়া। আর বাস্তবতার প্রথম শর্তটি হল কী থেকে কী হচ্ছে ও কী জন্য কী হচ্ছে এই কার্যকারণ সম্বন্ধ।

(৩) যেমন, লোরেন আইস্‌লী। তাঁদের প্রশ্ন এই : সব রকম মানবাকৃতি জীবের ভেতর শুধু আদি-মানুষই বুদ্ধিমান হল কেন?

(৪) The Silent Language / Edward T. Hall

(৫) পরবর্তী কালে অন্যান্য স্থানেও সভ্যতা এসেছে। নদী না থাকলেও মাটি ও সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে জলও সেখানকার প্রধান অবলম্বন। যে জল এসেছে বৃষ্টি রূপে আকাশ থেকে। জল ও সূর্য দুইই সেখানে আকাশের সন্তান। নদী-মাতৃক এলাকায় মাটি ও জল দুইই যেমন পৃথিবীর।

(৬) রাসেলের মতে, মানুষের native intelligence আগের চেয়ে যে এখন খুব বেশি কিছু বেড়েছে তা না, যা বেড়েছে তা হল সংরক্ষণ, শিক্ষা ও চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের দক্ষতা। এবং মানুষ প্রাযুক্তিক পরিবর্তনের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার চিন্তাধারায় তত দ্রুত পরিবর্তন আসে না। ফলে দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞা যায় কমে।

(৭) আমার একাধিক প্রবন্ধে মনস্তত্ত্ব ও বিহেভিয়ারিজমের এই দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে শিল্পায়ন : বুলেটিন (১)-য়ে প্রকাশিত মনস্তত্ত্ব : স্থান কাল ঘটনা-নিবন্ধে এর সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)

(৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মনন / শিল্পের প্রগতি কি বিজ্ঞান / প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক? প্রশ্নটি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পার-স্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, আসবে বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক আলোচনায়।

(৯) বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী ভিত্তিক আলোচনার অসুবিধা এই যে অসাধারণ

বিজ্ঞানীর কোন কোন সাধারণ কৃতিত্বও যতটা আলোচিত হয় সাধারণ বিজ্ঞানীর সাধারণের অধিক কিছু সাফল্যের ততখানি আলোচনা হয় না। একটা মাত্র উদাহরণ দিই—নবম শতকের জৈন বিজ্ঞানী মহাবীর ও তাঁর গণিত-সারসংগ্রহের কথা কজন জানে! প্রাচীনকালের ভারতীয় বহু গ্রন্থে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম সমূহই লিপিবদ্ধ হয়েছে, বিচার বিশ্লেষণের তেমন নিদর্শন নেই। এর কারণ তখন বিজ্ঞানের মৌখিক প্রসারের ঐতিহ্য ছিল, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মুখ থেকে মুখে সঞ্চারিত হত, লিপিবদ্ধ থাকত শুধু প্রাথমিক সূত্রটি। তাই প্রসঙ্গের তুলনায় প্রাচীন বিজ্ঞানের পদ্ধতির কথা কম জানা যায়। পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা বিশেষ করে গ্রীকরা শুরু করে। প্রসঙ্গত বলা যাক ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তা-ধারার পরস্পরের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল, যেমন ছিল ভারতীয় ও চীনা চিন্তাধারার। চীন ও ভারত দু দেশেই লোকবিজ্ঞানের বিশেষ প্রসার দেখা গেছে। আবহবিদ্যা, আকাশতত্ত্ব, কৃষিজ্ঞান, Custom—এ সব ছিল লোক-বিজ্ঞানের অঙ্গ।

(১০) এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার ওপর দাঁড়ানোর ভংগিতে আরিস্টটল হিটলারের সমগোত্র। বস্তুত উভয়ই এমন কোন বাক্য কখনো উচ্চারণ করেন নি যাতে নিজ নিজ জনগণের বিশ্বাস ইতিমধ্যেই না প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরিস্টটলের মতবাদকে ক্রিশ্চিয়ানিটি তার প্রধান প্রবক্তা হিশেবে নিয়েছিল আর পরে খৃষ্ট প্রভাবিত পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানই তাঁকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত করেছে। হিটলার আর্যবাদকে তাঁর প্রধান বক্তব্য রূপে উপস্থিত করেছিলেন আর আর্যদের হাত দিয়েই তাঁর চূড়ান্ত পতন ঘটেছে।

(১১) প্রায় আন্দোলনতুল্য এই নিঃশব্দ কাজের প্রসঙ্গে প্রথমে যাঁর নাম করতে হয় তিনি Cassiodorus। ইনি খৃ. ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিককার মানুষ।

(১২) সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে স্পেনীয় মুসলমানদের সভ্যতা ও অর্থনীতি ছিল অতুলনীয়। স্পেনে আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ডোবায় রাস্তার আলো ও ফুটপাথের প্রচলন ছিল, নাগরিক যে সুবিধার জন্য প্যারিস বা লণ্ডনকে আরও সাতশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

(১৩) এই বিজ্ঞান প্রসঙ্গে A. I. Herzen লিখছেন,

Scholasticism was neither fully religious nor fully scientific ; from the precariousness of its faith it sought syllogisms, from the precariousness of its logic it sought faith....There was no question of natural science : scholasticism despised nature so

much it could not study it...Learned studies at that time had a purely bookish character which they had not had in the ancient world: whoever sought learning, opened a book and turned away from life and nature. (Letters on the Study of Nature গ্রন্থ থেকে)

(১৪) '...boys who have completed the first stage of education and who are not going into agriculture, will have to learn a science, art or craft useful to society...(Also) the pupils are to be taken sometimes into factories and workshops where merchandise...is produced, so that they may have some idea of the advantages to human industry.' (১৭৯৪ খৃ. এ বিপ্লবোত্তর ফরাসী দেশের কনভেন্‌শন ডিক্রি থেকে উদ্ধৃতি)।

বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা যায় চার্চ ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজনে যে সব বিজ্ঞানীকে সমর্থন করেছিল ও প্রতিদানে তাদের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছিল, সেই সব বিজ্ঞানীর একটা বড় অংশ ধর্মতত্ত্ব থেকে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে নেন, আলকেমিবিদ হয়ে ওঠেন রসায়ন বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী হয়ে ওঠেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ধর্মবিদ হন দার্শনিক। কুসার নিকোলাস, কেপলার ও Paracelsus এর নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়।

এবার বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক। রেনেশাঁসের সময়কালে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিকের দেখা আমরা পাই নি বললেই চলে। দার্শনিক হিশেবে তখন যাঁদের খ্যাতি তাঁরা অধিকাংশই গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ বা রসায়ন-বিজ্ঞানী। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ে নিজেদের নানান্ পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারকে দার্শনিক ভিত্তি দেবার চেষ্টায় প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে অখণ্ডরূপে ভাববার প্রয়াস তাঁদের চিন্তায় ধরা পড়েছে।

(১৫) রেনেশাঁস ও বিজ্ঞানে বিপ্লব প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিজ্ঞানীর নাম করেছি তাঁদের এবং এ ছাড়াও জিয়োর্দানো ব্রুনোর আবিষ্কার, অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে এটাই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, প্রকৃতির নিয়ামক সূত্রগুলি তার আভ্যন্তরীণ সূত্র, বাইরে থেকে কেউ তা চাপিয়ে দিতে পারে না। এই বাস্তবমুখী অনুসন্ধিৎসাই ছিল ধনতন্ত্রের মূল সুর। ইটালিতে জন্ম হলেও বিজ্ঞানের নবযুগের দায়িত্ব পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ডের হাতে গিয়ে পড়েছে। কেননা তখন ফরাসী, ডাচ, ইটালীয় বা জরমন ধনতন্ত্রের তুলনায় ব্রিটিশ ধন-

তন্ত্রের অগ্রগতি হচ্ছিল অনেক দ্রুতগতিতে। ফ্রান্সিস বেকনকে ইংল্যাণ্ড পেয়েছে তখন তার ধনতান্ত্রিক, প্রায়োগিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রবক্তা হিশেবে, মার্কস যাঁকে অভিহিত করেছিলেন আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জনক রূপে।

(১৬) উক্তিটি J. D. Bernalএর Science in History গ্রন্থ থেকে নেওয়া। নিউটনের একক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ধারণের রীতিটি প্রচলিত হয়।

(১৭) যন্ত্রবিদ্যার আলোচনায় ভর বিষয়ক ধারণার সূত্রপাত করেন নিউটন, তিনি বস্তুর দুটি ভরের কথা বলেছেন—আভ্যন্তরীণ ভর ও মহাকর্ষজ ভর। উভয়ের মান যে সমান তা তিনি জানতেন। কিন্তু কেন সমান তার ব্যাখ্যা পেতে আইনস্টাইন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। যে ব্যাখ্যা জোগাতে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতা-তত্ত্বর জন্ম দেন ও সেই সঙ্গে প্রকৃতি সম্পর্কে অধিযন্ত্রবাদী প্রতীতি পরিত্যক্ত হয়।

(১৮) এই বিতর্কের অন্ততঃ তিনটে দিক ছিল। এক, দার্শনিকতা—লাইবনিৎস নিউটনের দর্শনের বিপ্লবাত্মক চরিত্রটি উপলব্ধি করেছিলেন ও তা বিশুদ্ধ ধর্মের মর্যাদা হানি করে বলে তার বিরোধিতায় নামেন। দুই, জাতীয়তাবাদ—লাইবনিৎস ছিলেন জারমানির রাজনৈতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পুনরুত্থানের মূল উদ্গাতা, ফলে স্বীয় অর্থাৎ স্বদেশীয় বিজ্ঞান ও দর্শন যাতে শ্রেষ্ঠ প্রচারিত হয়ে উঠতে পারে তা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিন, বৈজ্ঞানিক বিচার—যেখানে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মূল বিষয়। যেমন লাইবনিৎস নিউটনের দৃগবিজ্ঞানের দুর্বলতা ও ত্রুটি ন্যায্য ও যুক্তিগত ভাবে ধরিয়ে দেন।

(১৯) এই শতকেই একজন মহিলা, প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রূপে মনোনীত হলেন। ইনি ইটালির মারিয়া জি. অ্যাগনেসি।

(২০) সাত শতকের সীরীয় জ্যোতিষী সেবখত হিন্দু-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, হিন্দুদের জ্ঞানের, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম আবিষ্কারের যা গ্রীক ও ব্যবিলনবাসীদের চাইতেও উন্নত, এবং গণিত পদ্ধতির যা ভাষায় প্রশংসার অতীত, বিষয়ে বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। এর চারশো বছর পর আল বেরুনি সমসাময়িক ভারতীয়দের কথা লিখতে গিয়ে বলছেন, হিন্দুদের বিশ্বাস তাদের দেশের মত কোন দেশ নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত নয় আর কোন বিজ্ঞান। এরা নিষ্ফল, আত্মাভিমানী, নির্বোধ। অন্য জাতির সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলে এরা বুঝতে পেত এদের ধারণা কত ভুল। চারশো বছরের ভিতর এমন আমূল পট-পরিবর্তন কেন, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের

ট্র্যাজেডিটা কোথায় আমার 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান—ধারা ও ধরন' প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি। (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)

(২১) নির্দিষ্ট যে সমীকরণটির মাধ্যমে লগারিদম আত্মপ্রকাশ করে তা একটি বিভেদক সমীকরণ, গণিতের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন বিভেদক সমীকরণ। পরবর্তীকালে ব্রিগস log 1=0 ও log 10=1 ধরে, ১ থেকে ২০,০০০ ও ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার লগারিদমের এক বিস্তৃত টেবিল প্রস্তুত করেন।

(২২) কলনের সংক্ষিপ্ত গাণিতিক সংজ্ঞাটি এই: The Calculus, concerned with magnitudes that are changing, deals with constantly changing magnitudes by a process in which increasing smaller differences are found between increasing smaller intervals.

(২৩) পরিসংখ্যানের ব্যবহারিক প্রয়োগ এখন কৃষি, ঔষধ, জীববিজ্ঞান, জীবকোষ, মৌলকণা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দূরজ্ঞাপন, মনোমিতি, নৃতত্ত্ব, যন্ত্র-গণনা ও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যানের তাত্ত্বিক সাফল্যের কথা যা বললাম তার সারসংক্ষেপ করব এইভাবে—রাজনৈতিক পাটিগণিত, সম্ভাবনাতত্ত্ব, বিভিন্ন প্রকার বিস্তারণ বা বারবণ্টনের সূত্র ও নির্বাচিত নমুনা থেকে সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার নিয়ম।

(২৪) প্রযুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যুগ। তাই গণিত-শাখার একদিকে এসেছে স্বয়ংক্রিয় তত্ত্ব, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব ও গণকযন্ত্রের গণিত, অন্য-দিকে গুরুত্ব বেড়েছে নিরবচ্ছিন্ন গণিত, ফাংশনীয় বিশ্লেষণ এবং অসম্বদ্ধ গণিতের একাধিক শাখা—বিমূর্ত বীজগণিত, রেখাতত্ত্ব ও সমবায় বিশ্লেষণের। আরও সৃষ্টি হয়েছে গাণিতিক অর্থনীতি, গাণিতিক সমাজনীতি, সূক্ষ্ম জীববিদ্যা গণিত ও ক্রিয়া প্রণালী গবেষণা ইত্যাদি নানা শাখার।

(২৫) চশমার কাঁচের উদ্ভাবন হয়েছিল ১২৮০ সাল নাগাদ। কিন্তু চশমার দুটো কাঁচের লেন্স একত্র করে যে আরও শক্তিশালী কোন দৃকযন্ত্র, যেমন দূরবীক্ষণ, নির্মাণ করা সম্ভব তা ষোল শতকের শেষাশেষির আগে কেন কারও মাথায় আসে নি? প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে যে পরিণতি অনিবার্য ছিল তা সুদীর্ঘ তিনশো বছর ধরে বিলম্বিত হল কেন? কলম্বাসের ডিমের উদাহরণের মত ছোট্ট কোন্ ডিটেলে আটকে ছিল তা? মননস্ফুলিঙ্গের

অভাব? হয়তো তাই, যে অভাব অনুভূত হল রেনেশাঁসের সময়ে আর দূর হল বিজ্ঞান-বিপ্লবের কালে।

(২৬) বিশ শতকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গভীরতম যে দু-তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রতীতির সন্ধান মিলেছে হাইসেনবার্গের তত্ত্ব তার একটি, এর জন্য মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি নোবল পুরস্কার পান।

(২৭) এই চারটি শক্তির বিশেষত শেষ তিনটিকে নিয়ে গত তিন দশকে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে, পদার্থবিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পিয়ারল্‌স, পাউলি, ওয়াইনবার্গ, সোয়ার্‌ৎচাইল্ড, হফম্যান। আজ (i) (যা আলোকে ছড়িয়ে দেয়) ও (iii) (যার দ্বারা তেজস্ক্রিয়তা নির্ণীত হয়)র মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে। এদের সঙ্গে (iv) (যা প্রোটন ও নিউট্রনকে প্রচণ্ড টানে আবদ্ধ রাখে)এর মিলন ঘটাবার চেষ্টা চলছে। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ও ঋণাত্মক ভরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২৮) আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে এখন তৈরি করা যায় অধিক ফলনশীল বীজ, প্রতিরোধ করা যায় দুরারোগ্য ব্যাধি, রক্ষা ও শোধন করা হয় পরিবেশ, খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়; সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা, ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ ও বাতাসের গতি নির্ধারণ করা এবং শরীরের অভ্যন্তরে কোন্ ওষুধ কীভাবে কাজ করে জানা সমস্তই আইসোটোপের সাহায্যে সম্ভব।

(২৯) যে সমস্ত জৈব অনুঘটক প্রাণী ও উদ্ভিদের কলায় উৎপন্ন হয়ে জীবদেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তারাই এনজাইম। উদ্ভিদদেহে এনজাইম সংশ্লেষণের মাধ্যমে শ্বেতসার তৈরি করে যা মানবদেহে এনজাইমের সাহায্যে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে মানুষের কর্মশক্তি যোগায়। তাপমাত্রা, অম্লীয় মাধ্যম, ক্ষারীয় মাধ্যম ইত্যাদি তাদের সক্রিয়তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। হরমোন ও ভিটামিনের সঙ্গেও এনজাইমের সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি বৃহৎ অণুর সাংগঠনিক সূত্রের পরীক্ষাতেও এদের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

(৩০) এখানে রক্ত প্রসঙ্গে কিছু বলব। রক্ত প্রধানত অক্সিজেন এবং এ ছাড়া নানা রকম ভিটামিন, খনিজ-পদার্থ ও পুষ্টিদ্রব্য পৌঁছে দেয় শরীরের বিভিন্ন অংশে। রক্তের লোহিত কণা হিমোগ্লোবিন এই অক্সিজেন বয়ে আনে। হিমোগ্লোবিনের মত আর এক ধরনের প্রোটিন অণু মাইওগ্লোবিন

থাকে প্রাণীর পেশীকোষে। বয়ে আসা অক্সিজেনকে সংরক্ষিত করা এর কাজ। উভয় অণুর আণবিক গঠন আজ আবিষ্কৃত হয়েছে, অণুজীববিদ্যার কল্যাণে। রক্ত সংক্রান্ত বিবিধ পরীক্ষায় আজ কোষবিজ্ঞানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

(৩১) নিউটন ও লকের মাধ্যমে যেমন গণতন্ত্র, মার্কসের সমাজতন্ত্র সেইরকম ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের সাহায্য নিয়ে। যথা—

Socialism with society as everything, society conceived in terms of historical process based in Darwinian evolution with natural selection as its agent (উৎস : Science and Liberal Education/Bentley Glass)

(৩২) বুর্জোয়া ও অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক। সেখানে জনবিস্ফোরণের অজুহাত দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা চলে। সমাজের সাধারণ মানুষদের বলা হয়, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো এমনিতেই আর্থিক ও সামাজিক সমস্ত সংগতি একান্ত সীমাবদ্ধ, জনসম্পদই তার একমাত্র ও সম্ভাবনাময় সামাজিক মূলধন। ফলে জনসংখ্যা কমিয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী-শাসিত বর্তমান সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোন দায় গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের থাকবে কেন? জনবিস্ফোরণের চাপে এই সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে এদের বরং লাভ হতে পারে। তাই জন-নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি সফল করতে শাসকরা প্রলোভন, কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে। শুধু জনসমস্যা প্রসঙ্গে নয়, সার্বিক জনস্বাস্থ্য বিষয়েই ড. ল্যালি আমাকে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করা যায়,

Social medicine could be made successful only through social production and social distribution, how otherwise could everyone be guaranteed the work, rest, food, health and culture that are urgent for them? That is to say they need socialism and socialism only.

(৩৩) তার মানে কিন্তু এই নয় যে সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ সর্বত্র, সর্বকালে অবশ্যই একইভাবে হয়েছে ও অগ্রগতি অভিমুখী হয়েছে বা তাই হতে হবে। হয় নি। হয় নি বলেই সামাজিক অভিব্যক্তির স্বপক্ষে কোন তত্ত্ব এখনও খাড়া করা যায় না।

(৩৪) শুধু পাশ্চাত্য ভূমিতে নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশেও প্রযুক্তির বৃত্তিগত

সম্ভাবনা, ফলে, প্রযুক্তি-পাঠে আগ্রহ কীরকম বেড়েছে এই ছোট উদাহরণে তা বোঝা যাবে—

হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুশীলনের বিভিন্ন শাখায় পাঠরত ছাত্রসংখ্যার শতকরা অনুপাত :

	১৯৫৭	১৯৬৯
মানবিকবিদ্যা	৩৭'৩	৬'০
বিজ্ঞান	৭'২	১৬'০
প্রযুক্তি	৫'০	২৬'০

(৩৫) পরিবেশ দূষণের জন্য মূলতঃ মানুষ নিজেই কিন্তু দায়ী। এ বিষয়ে চমৎকার একটি ব্যঙ্গ কবিতা ড. টি. ল্যালির কাছ থেকে শুনেছিলাম। কবির নাম গ্যারি ডানফোর্ড, অংশ-বিশেষের অনুবাদ নিচে দিলাম।

আদিতে—মানুষ জলাভূমি আর কর্দমকূপ তৈরি করেছিল…
এতে প্রথম দিবস গেল,
পরে মানুষ তৈরি করল কসাইখানা আর চিড়িয়াখানা…
এতে দ্বিতীয় দিবস গেল…
পরে মানুষ, শেষ, শিকার করে একেবারে শেষ করে দিল বুনো মোষ,
এতে তৃতীয় দিবস গেল…
পরে মানুষ তৈরি করল নর্দমা, সাজিয়ে রাখল জঞ্জাল,
এতে চতুর্থ দিবস গেল…
পরে মানুষ তৈরি করে ছড়িয়ে দিল তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল,
এতে পঞ্চম দিবস গেল…
পরে মানুষ তৈরি করল রাসায়নিক যুত যা হত্যা করে নিঃশব্দে,
এতে ষষ্ঠ দিবস গেল…
আর সপ্তম দিবসে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শান্তি, শুধু ছিল
ঝড়ের আর সমুদ্র ঢেউয়ের আর্ত হাহাকার
আর মারা যাচ্ছিল পাখিরা, মারা যাচ্ছিল শামুক ও মাছেরা
মারা যাচ্ছিল সমুদ্র বাতাস, লতাগুল্মবৃক্ষ মরে যাচ্ছিল…
আর তখন নিজের কৃত কার্য থেকে মানুষ বিশ্রাম নিল।

(৩৬) মহাকাশ অভিযানের গবেষণায় কী পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, (তা অপব্যয় বা অপচয় কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন) তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যেমন, মহাকাশ গবেষণাগার স্যাটারন-৫-কে মহাশূন্যে

পাঠাতে ফ্রান্সের বার্ষিক বাজেটের দেড়গুণ খরচ হয়েছিল। ১৯৬৪-তে রেঞ্জার-৭-এর পেছনে খরচ করা হয় ২৬০,০০০,০০০ ডলার, যা দিয়ে আমেরিকার প্রতিটি পরিবারকে ৪০০০ ডলার করে সাহায্য দেওয়া যেত, এই পরিমাণ অনুন্নত দেশগুলিকে আমেরিকা যে বাৎসরিক অর্থসাহায্য দেয় তার কুড়ি গুণ। (রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি এটা যে প্রায় এই পরিমাণ টাকাই আমেরিকাকে প্রতি বৎসর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়।)

(৩৭) বিজ্ঞান গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি এইরূপ—

(i) জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমুদ্রবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শাখায় গবেষণা কোন বিশেষ দেশের একক প্রয়াস হতে পারে না, এখানে তথ্য ও জ্ঞানের আরও আদান-প্রদান তাই দরকারি।

(ii) যে সব গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ তা যদি আন্তর্জাতিক স্তরে করা যায় তবে যন্ত্রপাতির ব্যয় ও অন্যান্য প্রাথমিক খরচ অনেক কমে যায়।

(iii) অনেক নতুন শাখায় বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর সংখ্যা প্রতিটি দেশেই স্বল্প, কয়েকটি দেশ একসাথে মিলে কাজ করলে এই সংখ্যা ফলপ্রসূভাবে বৃদ্ধি পায়।

(iv) জনস্বার্থ-সংক্রান্ত বহু ব্যবহারিক গবেষণায় ও প্রাযুক্তিক প্রসঙ্গে, মূল সমস্যা সমস্ত দেশেই প্রায় এক। প্রতিযোগিতামূলক না করে সহযোগিতামূলক করলে একই সমস্যার বারংবার সমাধানের হাত থেকে এই সব গবেষণা মুক্তি পাবে।

গ্রন্থপঞ্জী

New Lives for Old/Margaret Mead
From Myth to Reason/I. W. Riley
Magic, Science and Religion/B. Malinowski
Science and Human Imagination/M. B. Hesse
The Silent Language/E. T. Hall
Science as Metaphor/R. Olson
The Major Achievements of Science/A. Mckenzie
Science and Mankind/M. L. Oliphant
Science Advances/J. B. S. Haldane
Science—Its Method and Its Philosophy/G. B. Brown
Science and Civilization/C. Singer, A. Ritchie
The Autobiography of Science/F. R. Moulton
Science in History (Vols. 1-4)/J.D. Bernal
A General History of the Sciences (Vols. 1-4)/Ed. R. Taton
The Realm of Science (Vols. 1-20)/
Directed by D. Rosenberg
The Nature of Science/D. M. Knight
Science & Medieval Thought/T. C. Allbutt
Physical Science in the Middle Ages/E. Grant
Man and Nature in the Renaissance/A. G. Debus
A Short History of Science and Scientific Thought/
F. S. Taylor
Science and Change/H. Kearney
Letters on the Study of Nature/A. I. Herzen
Science, Medicine and Society in the Renaissance (Vols. 1-2)/
Ed. A. G. Debus

History of Science (Vols. 1-3)/ Ed. A. Crombie, M. Hoskin
New Treasury of Science/Ed. H. Shapley, S. Rapport, H. Wright
Scientific Thought in the Twentieth Century/ Ed. A. E. Heath
Cosmos, Earth and Man/P. Cloud
The Emergence of Science in Western Europe/M. Crosland
Impact of Science on Society/Bertrand Russell
Science and the Social Order/B. Barber
Science and Human Values/J. Bronowski
Science, Logic and Political Action/M. C. Goodall
Civilization and Science—In Conflict or Collaboration ?/ Ciba Foundation Symposium
Man and His Future/Ciba Foundation Symposium
Has Man a Future ?/Bertrand Russell
A Short History of the World/H. G. Wells
Limitations of Science/J. W. N. Sullivan
Chance and Necessity/J. Monod
Introduction to Psychology/N. L. Munn, L. D. Fernald, P. S. Fernald
Science and Policy/A. King
Understanding Technology/C. Susskind
Data : Mirrors of Science/R. Houwink
The World of Man in the World of Nature/I. Laptev
Science and Technology in Developing Countries/ Conference, University of Beirut

প্রবন্ধের ও পত্রিকার তালিকা—

মনস্তত্ত্ব : স্থান কাল ঘটনা/ধীমান দাশগুপ্ত/প্রথম সংখ্যা, শিল্পায়ন, ১৯০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান—ধারা ও ধরন / ধীমান দাশগুপ্ত / প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী-গ্রন্থের পরিশিষ্ট, বাণীশিল্প, ১১৩ই কেশব সেন স্ট্রীট
Annals of Science, Vols. 34, 36, 37 ; 4 John street, London

নির্ঘণ্ট ও পরিভাষা

(সূচিপত্রে উল্লেখ নেই প্রধানত এমন সব নাম শব্দ ও বিষয়ের তালিকা)

উপন্যাস

নী	বনফুল	৭.০০
মগ্নচন্দ্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭.০০
জীবনের স্বাদ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৭.০০
করুণাবশত	মতি নন্দী	৭.০০
অনন্ত চতুর্দশী	ধীমান দাশগুপ্ত	৬.০০

গল্প

বনফুলের শেষলেখা	বনফুল	৭.০০
বনফুলের নূতন গল্প (২য় সংস্করণ)	বনফুল	১০.০০
অকথিত কাহিনী	শিবরাম চক্রবর্তী	৭.০০

জীবনীসাহিত্য

শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত (২য় সংস্করণ)	নীরেন্দ্র গুপ্ত সংকলিত	১১.০০
শ্রীমধুসূদন (নাটক)	বনফুল	৬.০০
জননীকথা	সুধাংশু পাত্র	১১.০০

কিশোরসাহিত্য

শারলক হোমসের শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সংস্করণ)	আরথার কোনান ডয়েল	১০.০০
প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী (৪র্থ সংস্করণ)	সুধাংশু পাত্র	১০.০০
ভারতের বিজ্ঞানসাধক (৩ খণ্ড, ২য় সংস্করণ)	সুধাংশু পাত্র প্রতি খণ্ড	৭.০০
কিশোর অমনিবাস (৪র্থ সংস্করণ)	উপদেষ্টা : বনফুল/শিবরাম চক্রবর্তী সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত	১০.০০
বাঘের দুধ	সুনীল জানা	৬.০০

বিবিধ

একশো ছড়া	ভূমিকা : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত	৮.৫০
হাজার বছরের বাংলা কবিতা	সম্পাদনা : বীতশোক ভট্টাচার্য	১৬.০০

যন্ত্রস্থ

হেমিংওয়ে অমনিবাস	অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বীতশোক ভট্টাচার্য	১৫.০০
চলচ্চিত্রের অভিধান	সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত	৩০.০০

১৯[illegible]

১৮[illegible]

১৮[illegible]

১৯০০-১

১৯২০

১৯৪[illegible]

১৯৬[illegible]

সম[illegible]
করা

ব্রো

প্রচা